নেতাজীর জীবনী ও বাণী

(আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্ট ও ফৌজের সম্পূর্ণ ইতিহাস, আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার, আগষ্ট আন্দোলন ও বাংলার হলদিঘাট—মেদিনীপুরের কাহিনী সম্বলিত)

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ সিংহ এম. এস্-সি., বি-এল.

সোল এজেণ্টস্ঃ
ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি
৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দাম ঃ দুই টাকা

প্রকাশক :—
শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ গাঁতাইত
৩৪ বি, রামতনু বসু লেন
কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ—১৩৫২ সাল

প্রিণ্টার—শ্রীরসিকলাল পান
গোবর্দ্ধন প্রেস
২০৯, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সূচীপত্র

নেতাজীর বাণী

[পত্রাবলীর মর্ম্মাংশ]

সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতার সারমর্ম্ম

রাষ্ট্রপতি সুভাস চন্দ্র বসু

সুভাষচন্দ্রের জীবনী ও বাণী

আজ সমস্ত ভারতবাসী কি হিন্দু, কি মুসলমান সকলেই নেতাজী সুভাষচন্দ্রের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন করছেন। সুভাষচন্দ্রের দেশের প্রতি গভীর ও একনিষ্ঠ ভালবাসা, দেশকে স্বাধীন করিবার উগ্র আকাঙ্ক্ষা, দেশের সেবার জন্য আজীবন অশেষ দুঃখকষ্ট ভোগ, তাঁর পবিত্র কলঙ্কহীন চরিত্র, দেশের জন্য তাঁর সর্ব্বস্ব ত্যাগ, তাঁর দুঃখময় নিঃস্বার্থ ব্রহ্মচারীর জীবন, তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ও রাজনৈতিক বিজ্ঞতা এবং তাঁর অসীম দুর্জ্জয় সাহস, সংগ্রামাত্মক মনোভাব—এই সকল গুণের জন্য নেতাজী দেশবাসীর নিকট দেবতার ন্যায় পূজার অর্ঘ পাইতেছেন। আমরা বাঙালী, আমাদের পক্ষে তিনি আরও গৌরবের পাত্র; কারণ সুভাষচন্দ্রও সোনার বাঙ্গালা মায়ের সন্তান এবং আমাদের অতি প্রিয় জন। বাঙ্গালার জল, বাঙ্গালার মাটি, বাঙ্গালার বায়ু তাঁহাকে মানুষ করিয়াছিল। তাই তিনি মনেপ্রাণে বাঙ্গালী ছিলেন। এই দেশপ্রেমিকের জীবনের নাটকীয় ঘটনাবলীর সহিত পরিচিত হইবার আন্তরিক ইচ্ছা সকলের মনে আজ জেগে উঠেছে। তাঁর জীবনী ও বাণী আমাদের কাছে খুব প্রিয়তর।

মাতাপিতা—সুভাষচন্দ্রের পৈতৃক বাসস্থান ছিল চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত কোদালিয়া গ্রামে। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে

২৩শে জানুয়ারী উড়িষ্যার প্রধান সহর কটকে সুভাষচন্দ্রের জন্ম হয়। সুভাষচন্দ্রের পিতার নাম স্বর্গীয় জানকীনাথ বসু। তিনি কটকে ওকালতী করিতেন। তখন উড়িষ্যা বাংলা প্রদেশের অন্তর্গত ছিল। জানকীনাথ তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য ও আইন জ্ঞানের জন্য সরকারী উকিল পদ প্রাপ্ত হন এবং স্থানীয় উকিল সমিতির নেতা ছিলেন। তিনি খুব উদার প্রকৃতির ও জনপ্রিয় লোক ছিলেন। জনপ্রিয়তার জন্য তিনি অনেক বৎসর কটক মিউনিসিপ্যালিটি ও জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যানের পদ অলঙ্কৃত করেন। এই সব জনহিতকর কার্য্যের জন্য রাজসরকার তাঁহাকে 'রায় বাহাদুর' উপাধি দেন। জানকীনাথের দেশপ্রেমও কম ছিল না। আইন অমান্য আন্দোলন দমন করিবার জন্য ভারত সরকার কঠোর নীতি অবলম্বন করেন। জানকীনাথ এই নীতির প্রতিবাদে রাজপ্রদত্ত 'রায় বাহাদুর' খেতাব ত্যাগ করেন।

সুভাষচন্দ্রের মাতা শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দেবী একজন আদর্শ হিন্দুমহিলা। তিনি অত্যন্ত ধর্ম্মপ্রাণা, দানশীলা, পরদুঃখকাতরা রমণী। তাঁহার স্বামী প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিলেও প্রভাবতী সাধারণভাবে থাকিতেন এবং তাঁহার পুত্রকন্যাদিগকে সাধাসিধে ধরণে মানুষ করেন।

মাতাপিতা পুত্রকন্যাদের নিকট জীবন্ত আদর্শ। পৃথিবীতে যে সকল লোক সামান্য অবস্থা হইতে বড় হইয়াছেন, তাঁহারা বাল্যকালে মা-বাপের নিকট হইতে শিক্ষা ও প্রেরণা লাভ করিয়াছেন। শিবাজী, বিদ্যাসাগর, নেপোলিয়ন এব্রাহাম,

লিন্‌কল্‌ন প্রভৃতি মহাপুরুষদের জীবনে মায়ের শিক্ষার প্রভাব প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। শিবাজীর মাতা শিবাজীকে বাল্যকালে ভারতীয় বীরদের কাহিনী শুনাইতেন। সেইজন্য শিবাজী এত বড় বীর হইয়াছিলেন। পিতা জানকীনাথের তেজস্বিতা ও স্বদেশপ্রেম এবং মাতা প্রভাবতীর ধর্ম্মপ্রাণতা, সহৃদয়তা, সারল্য পুত্র সুভাষচন্দ্রের জীবনকে বহুলাংশে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল।

জানকীনাথের আটটি পুত্র ও ছয়টি কন্যার মধ্যে ছয়টি পুত্র ও দুইটি কন্যা জীবিত আছেন। ছয় পুত্রের নাম শ্রীসতীশচন্দ্র বসু, শ্রীশরৎচন্দ্র বসু, শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু শ্রীসুধীর চন্দ্র বসু, ডাঃ সুনীলচন্দ্র বসু ও শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু। সতীশচন্দ্র ও শরৎ চন্দ্র কলিকাতা হাইকোর্টের সুবিখ্যাত ব্যারিষ্টার। শরৎচন্দ্র ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ জননায়ক। সুনীলচন্দ্র কলিকাতার বিখ্যাত চিকিৎসক। সব ভাইদের মধ্যে শরৎচন্দ্র শৈশবকাল হইতে সুভাষকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। পরবর্ত্তী রাজনৈতিক জীবনেও যখন সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস উপরওয়ালাদের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন তখন শরৎচন্দ্র ছোট ভায়ের কার্য্যাবলীর অনুমোদন করিয়াছিলেন।

বাল্যকাল—সুভাষচন্দ্র পাঁচ বৎসর হইতে বার বৎসর পর্য্যন্ত কটকে খৃষ্টীয় মিশনারী (পাদ্রী) স্কুলে পাঠ করেন। বিদেশী স্কুলে পাঠ করিলেও বিদেশী সভ্যতার ও সমাজের কোন খারাপ প্রভাব তাঁর চরিত্রে প্রবেশ করে নাই। বরঞ্চ সুভাষচন্দ্র

পাদ্রীদের কতকগুলি ভাল গুণ অনুকরণ করেন এবং এখানে তাঁহার ইংরাজি শিক্ষার বনিয়াদ গড়ে উঠে।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে সুভাষচন্দ্র র‍্যাভেন্‌শা কলেজিয়েট স্কুলে ভর্ত্তি হন। এই স্কুল হইতে তিনি ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে সতের বৎসর বয়সে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হন। ইংরাজী পরীক্ষায় তিনি এত ভাল উত্তর করিয়াছিলেন যে পরীক্ষক নিজেও ঐরূপ উত্তর করিতে পারিতেন না বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি বিদ্যালয়ে সর্ব্ব পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিতেন। গৃহে যেমন মাতাপিতার চরিত্র পুত্রের চরিত্রকে প্রভাবান্বিত করে, বিদ্যালয়ে তেমন শিক্ষকের চরিত্র ছাত্রের চরিত্রকে প্রভাবান্বিত করে। আদর্শ শিক্ষক বেণীমাধব দাস মহাশয়ের মহৎ গুণাবলী সুভাষচন্দ্রের জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে।

স্কুলে পাঠ্যাবস্থায় তাঁহার জীবনে অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন ঘটে এবং ধর্ম্মের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মে। তের বৎসর বয়সের সময় হইতে সুভাষচন্দ্র শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ও স্বামী বিবেকানন্দের পুস্তকাদি পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। তিনি তাঁহাদের উপদেশমত ধ্যান-ধারণা অভ্যাস করেন এবং চরিত্র-গঠন করেন। ধনীর দুলাল হইয়াও বাল্যকাল হইতেই পার্থিব সুখের প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা হয়। ধর্ম্মজীবন যাপন করিবার জন্য তাঁহার হৃদয়ে প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মে। মাতৃদেবীর সহিত তিনি প্রায়ই ধর্ম্মালোচনা করিতেন। তিনি পড়াশুনা করা অপেক্ষা দরিদ্র

নারায়ণের সেবা, রুগ্নের শুশ্রূষা করিতে ভালবাসিতেন। এই সময়ে তাঁহার জীবনে একটি উচ্চ ও মহৎ আদর্শের বীজ উপ্ত হয়। এই অল্প বয়সে যে আধ্যাত্মিক প্রভাব তাঁহার জীবনে দেখা যায়, সেই প্রভাব তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনকে বহু পরিমাণে গঠিত করে।

কলেজ জীবন—১৯১৩ খৃষ্টাব্দে সুভাষচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজে আই-এ ক্লাসে ভর্ত্তি হন এবং সংস্কৃত, গণিত ও লজিক এই কয়টি বিষয় পাঠ্যরূপে গ্রহণ করেন। তখনকার দিনে প্রত্যেক স্কুলে ও কলেজে ভাল ছাত্রদের একটি দল থাকিত। চিরকুমার থাকিয়া আজীবন দেশসেবা করাই ইহাদের মূলমন্ত্র ছিল। পাঠ ছাড়া ব্যায়ামচর্চ্চা, ধ্যান-ধারণা ইহাদের নিত্যকর্ম্ম ছিল। দলপতি সভ্যদের চরিত্র-গঠনের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। আজকাল ছাত্রদের মধ্যে এইরূপ আন্দোলন খুবই কমিয়া আসিতেছে। উচ্চ রাজনীতি চর্চ্চা ভাল কিন্তু ছাত্রজীবনের সঙ্গে সঙ্গে চরিত্র-গঠন না হইলে ভবিষ্যৎ জীবনে কোন মহৎ কাজ করা যায় না। কলিকাতায় সুভাষচন্দ্র এইরূপ একটি ভাল দলে যোগদান করেন। ডাঃ সুরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডক্টর প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ এই দলে ছিলেন। ইহারা সকলেই প্রসিদ্ধ দেশসেবক ও চিরকুমার। প্রফুল্ল চন্দ্র টাকশালে ১৭০০ টাকা মাহিনার চাকরি ত্যাগ করিয়া অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। বর্ত্তমানে তিনি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য।

এই সময় সুভাষচন্দ্রের জীবনে এক অলৌকিক ঘটনা ঘটে। পূর্ব্ব হইতে সংসারের প্রতি বিতৃষ্ণা এবং সন্ন্যাস জীবনের প্রতি আগ্রহ

প্রবল হইয়া উঠে। হিমালয়ে ও তীর্থস্থানে অনেক সাধু সন্ন্যাসী বাস করেন ইহা তিনি জানিতেন। উপযুক্ত গুরুর উপদেশ ব্যতীত মোক্ষ পাওয়া যায় না। তাই বুদ্ধের মত তিনি সংসারের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করিয়া ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে শীতকালে আত্মীয়-স্বজনের অজ্ঞাতে সদ্‌গুরুর সন্ধানে অকস্মাৎ গৃহত্যাগ করেন। তিনি দিনের পর দিন দারুণ শীতে হিমালয়ের হিংস্রজন্তুপূর্ণ বনে জঙ্গলে পাহাড় পর্ব্বতে ঘুরিয়া বেড়াইলেন। উপযুক্ত আহার নাই, উপযুক্ত বস্ত্র নাই। সেদিকে তাঁহার কোন ভ্রূক্ষেপই ছিল না। তারপরে তিনি হরিদ্বার, মথুরা, বৃন্দাবন, গয়া প্রভৃতি তীর্থস্থানেও গুরুর সন্ধানে পাগলের মত পরিভ্রমণ করেন। তিনি আগ্রাতে প্রেমানন্দ বাবাজী, বৃন্দাবনে সাধুপ্রবর রামকৃষ্ণ দাস বাবাজী, বারাণসীতে রাখাল মহারাজের সাক্ষাৎ লাভ করেন। অনেক মন্দিরের মোহান্তর জীবন-প্রণালীও অবগত হন কিন্তু ইহাদের কেহই তাঁহার ধর্ম্মতৃষ্ণা তৃপ্ত করিতে পারিলেন না। উপরন্তু রাখাল মহারাজ বাপ-মার অনুমতি না লইয়া আসাতে সুভাষচন্দ্রকে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে উপদেশ দেন। তিনি শেষে হতাশ হইয়া অকস্মাৎ একদিন গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, যেমন অকস্মাৎ তিনি গৃহত্যাগ করেন। দীর্ঘ ছয় মাস অনুপস্থিতির পর হঠাৎ আবির্ভাবে প্রভাবতী কাঁদিয়া বলিলেন, "সুভাস, তুমি কি আমাকে মেরে ফেলবার জন্য জন্মিয়েছ ?" মাতাপিতা আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সকলেই সুভাষচন্দ্রকে দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হইলেন।

এই নিরুদ্দেশ্যে যাত্রার বিষয় ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে তাহার এক বন্ধুকে তিনি জানান, "আমি দিন দিন বুঝতে পারছি যে আমার জীবনে ভগবান নির্দ্দিষ্ট একটি উদ্দেশ্য আছে। সেই উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য আমি দেহ ধারণ করিয়াছি। আমি গতানুগতিক ভাবে জীবন যাপন করিব না।"

এই স্বেচ্ছাকৃত কষ্টদায়ক ভ্রমণে সুভাষের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া যায় এবং তিনি টাইফয়েডে দীর্ঘকাল শয্যাগত থাকেন। পরে তিনি কার্সিয়াং যাইয়া স্বাস্থ্য-লাভ করেন। তিনি ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম বিভাগে আই-এ পাশ করেন।

দর্শনশাস্ত্রে অনার্স লইয়া তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে বি, এ পড়েন। কলেজেই চরিত্র-প্রভাবে সুভাষচন্দ্র ছাত্রদিগের নেতা হন। এই সময়ের এক ঘটনা তাঁহার জীবনে এক পরিবর্ত্তন আনয়ন করে। ইংরাজির অধ্যাপক মিঃ এফ-ওটেন ক্লাসে ছাত্রদিগের সঙ্গে অপমানজনক ব্যবহার করিতেন। তিনি একদিন বি, এ, ক্লাসের একটি ছেলের গালে চড় মারেন। ইহার ফলে ছেলেরা ধর্ম্মঘট করে। যাহা হউক কর্ত্তৃপক্ষ ইহা মিটমাট করিয়া দেন। একমাস পরে মিঃ ওটেন পুনরায় ছাত্রদিগকে অপমান করেন। আত্ম-সম্মান সকলেরই আছে। এই দুর্ব্ব্যবহার ছাত্রদের সহ্যের সীমা অতিক্রম করে। ছাত্ররা ধৈর্য্য হারাইয়া ওটেনকে প্রহার করে। কর্ত্তৃপক্ষ শাস্তিস্বরূপ কতিপয় ছাত্রকে কলেজ হইতে বহিষ্কার করিয়া দেন। সুভাষচন্দ্র দলের নেতা ছিলেন বলিয়া দুই বৎসরের জন্য বহিষ্কৃত হইলেন। তিনি বলেন,

"এই ঘটনা তাঁহার জীবনে স্মরণীয় দিন। মহৎ কাজের জন্য দুঃখ ভোগ করায় যে আনন্দ তাহা আমি জীবনে সর্ব্বপ্রথম অনুভব করিলাম। আমার জীবনে এই প্রথম নীতি ও স্বাদেশিকতার কঠোর পরীক্ষা হইয়া গেল।"

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে স্যার আশুতোষের চেষ্টায় তিনি স্কটিশ চার্চ্চ কলেজে বি, এ ক্লাসে ভর্ত্তি হন। তথা হইতে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে দর্শন শাস্ত্রে অনার্সে প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া তিনি বি, পাশ করেন। সুভাষচন্দ্র ইউনিভারসিটি ট্রেণিং কোরেও যোগদান করেন।

বিলাতে পাঠ্যাবস্থা—এই সময়ে পাঞ্জাবে জালিয়ানবাগে ওডোয়ার কর্ত্তৃক নিরস্ত্র জনতার উপর গুলি চালনা, খিলাফত ব্যাপার ও রাউলাট আইন প্রবর্ত্তন লইয়া দেশে তুমুল আন্দোলন জাগিয়া উঠিয়াছে। শাসকবর্গও দেশব্যাপি কঠোর নীতি আরম্ভ করিয়াছেন। পাছে ভাবপ্রবণ সুভাষচন্দ্র এই আন্দোলনে যোগ দেয় এই ভয়ে সুভাষচন্দ্রের পিতা সুভাষচন্দ্রকে পড়াইবার জন্য ও বিলাতি আবহাওয়ায় মনের পরিবর্ত্তনের জন্য বিলাত পাঠাইবার প্রস্তাব করিলেন। সুভাষচন্দ্র ইংরাজের গোলামি করিতে ঘৃণা বোধ করেন। যে শাসকের অত্যাচার হইতে দেশকে বাঁচাইতে হইবে তাহারই চাকরি করিতে হইবে—ইহা ভাবিতেও তাঁহার প্রাণে কষ্ট হইতে লাগিল। শেষে অনেক মানসিক তর্কের পর এবং বন্ধুদের ও আত্মীয় স্বজনের অনেক অনুরোধে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিলাত যাইতে

মনস্থ করিলেন। সেখানে পিতা যাহা ভাবিয়াছিলেন তাহা হইল না। পাশ্চাত্য সভ্যতার চাকচিক্য তাঁহার মনকে আকৃষ্ট করিতে পারিল না। উপরন্তু তথাকার অধিবাসীদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, সামরিক ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা, আর্থিক অবস্থার সহিত ভারতবাসীর পরাধীনতা, শিক্ষার অভাব, আর্থিক দুর্দ্দশার তুলনা করিয়া তিনি মনে খুব দুঃখ অনুভব করিলেন।

ভারতবাসীর অপমানে সুভাষচন্দ্র যেমন ব্যথিত হইতেন ভারতবাসীর সম্মানেও তিনি খুবই আনন্দিত হইতেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু ও শ্রীযুক্তা রায় একটি সভাতে ওজঃস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করেন। সেখানে বহু লোক সমাগম হইয়াছিল। নাইডুকে সকলেই সন্মান করেন। সুভাষচন্দ্র এই বক্তৃতার বিষয় বলেন, "যে দেশ নাইডুর মত রমণীর জন্ম দিতে পারে সে দেশ স্বাধীন হইবেই।"

অনেক ছাত্রই বিলাতে যাইয়া বাপের টাকা লইয়া ছিনিমিনি খেলা করে এবং বিলাস-বসনে অপব্যয় করে। কিন্তু সুভাষ চন্দ্র অত্যন্ত মিতব্যয়ী ও পরিশ্রমী ছিলেন। বিলাত যাইবার মাত্র নয় মাসের মধ্যে সুভাষচন্দ্র I. C. S. পরীক্ষায় কেবল উত্তীর্ণ হন না পরন্তু তিনি পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার করেন এবং ইংরাজি রচনায় প্রথম হন। এই অল্প সময়ের মধ্যে I. C. S.-এর মত কঠিনতম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সুভাষচন্দ্রের অসাধারণ বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেয়।

পরীক্ষায় পাশ করায় তিনি খুব দুঃখিত হইলেন কিন্তু

নিজের আদর্শকে ভুলিলেন না। এক বৎসর অনেক চিন্তার পর তিনি ভারত সচিবের অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া পদত্যাগ পত্র দাখিল করিলেন। এই চাকরি অনেকের পক্ষে স্বর্গ সমান। চাকরিজীবি বাঙ্গালীর এর চেয়ে বেশী কাম্য কিছু নাই। চাকরিতে আড়াই হাজার টাকা মাহিনা, আরও উচ্চ বেতনের হাইকোর্টের জজ বা বিভাগীয় কমিশনার পর্যন্ত হওয়া যায়। এত বড় লোভ সম্বরণ করা খুব মানসিক বলের দরকার। এ কি সোজা স্বার্থত্যাগ! তিনি ১৯২১ খৃষ্টাব্দে মে মাসে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, (অনার্স সহ) ডিগ্রি লইয়া ১৬ই জুলাই দেশে ফেরেন।

ভারতে আগমন—তখন ভারতে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন পূর্ণভাবে আরম্ভ হয়েছে। ইংরাজ রাজত্ব ভারতবাসীর সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল। পুলিশ, রেল, পোষ্টাফিস, আফিস, আদালত, হাঁসপাতাল এমন কি সৈন্যবিভাগ সবই ভারতবাসী চালায়। মহাত্মা চেয়েছিলেন—এই সব লোক চাকরি ছাড়িয়া দিলে ইংরাজ রাজত্ব একদিনেই অচল হবে। সুভাষচন্দ্র প্রথমেই বোম্বাইতে গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করেন কিন্তু গান্ধীজির সহিত আলোচনায় তাঁহার কার্য প্রণালীর বিষয়ে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। তৎপরে সুভাষচন্দ্র বাংলার নেতা দেশবন্ধুর সহিত দেখা করেন। দেশবন্ধুর কথায় তিনি মুগ্ধ হন এবং দেশবন্ধুর অনুচররূপে দেশসেবায় জীবন উৎসর্গ করেন।

জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষ—গান্ধীজির আহ্বানে অনেকেই

ওকালতি ডাক্তারি ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। অনেক ছাত্রও স্কুল কলেজ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। এই সব ছাত্রদের জন্য প্রত্যেক প্রদেশে জাতীয় কলেজ স্থাপিত হইয়াছিল। সুভাষচন্দ্র কলিকাতার জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষ ও কংগ্রেস কমিটির প্রচার কর্তা নিযুক্ত হন। অধ্যক্ষ হিসাবে তিনি ছাত্রদিগের মনে প্রথমেই জাতীয়তা ও ত্যাগের কথাই শিক্ষা দেন। সরকার বাহাদুর এই কলেজগুলিকে অঙ্কুরেই বিনাশ করিবার সুযোগ খুজিতে লাগিলেন।

যুবরাজ বয়কট—১৯২১ খৃষ্টাব্দের ১৭ই নবেম্বরে ইংলণ্ডের যুবরাজ ও ভারতের ভাবী সম্রাট ভারতে আগমন করেন। কংগ্রেসের নির্দ্দেশে সমস্ত ভারত ঐদিন দোকান-পাট যান-বাহন বন্ধ করিয়া শান্তিভাবে পূর্ণ হরতাল পালন করে। গভর্ণমেণ্টের নীতির প্রতিবাদে এইরূপ করা হয়। যুবরাজের প্রতি ব্যক্তিগত অসম্মান কাহারও ছিল না। বাংলায় তখন সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠিত হয়। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী কলিকাতায় ১৭ই তারিখের হরতালকে পরিচালনা করে। যুবরাজের ২৫ শে ডিসেম্বর কলিকাতায় আসার কথা। সেইজন্য ১৯ শে নভেম্বরে বাংলা সরকার স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে বে-আইনী ঘোষণা করেন এবং কলিকাতায় শোভাযাত্রা ও সভা নিষিদ্ধ করেন। নেতারা এই আদেশ অমান্য করেন। এই প্রথম আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হয়। দেশবন্ধু, সুভাষচন্দ্র, মৌলানা আজাদ, বীরেন্দ্র শাসমল প্রভৃতি অনেকে গ্রেপ্তার হন। ইহা সত্ত্বেও

২৫শে কলিকাতায় পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। সুভাষচন্দ্রের ও দেশবন্ধুর প্রথমবার ছয় মাস কারাবাসের আদেশ হয়। এত কম দণ্ডে সুভাষচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "আমি কি মুর্গী চোর যে এত কম দণ্ড হল।" কারাগারে দেশবন্ধুর সহিত সুভাষের খুব ঘনিষ্টতা জন্মে।

উত্তরবঙ্গ প্লাবন—১৯২২ খৃষ্টাব্দে সুভাষচন্দ্র মুক্তিলাভ করেন। তখন উত্তরবঙ্গে প্রবল বন্যায় সহস্র সহস্র লোক গৃহহীন হইয়াছে। সুভাষচন্দ্র তৎক্ষণাৎ একটি সঙ্কট-ত্রাণ সমিতি গঠন করিয়া স্বেচ্ছাসেবক লইয়া উত্তরবঙ্গে কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাপাইয়া পড়িলেন। তিনি শীঘ্রই চারিলক্ষ টাকা চাঁদা তুলিলেন এবং প্রচুর কাপড়, খাদ্যদ্রব্য যোগাড় করিলেন। তাঁহার কর্ম্ম-কুশলতায় তদানীন্তন গভর্ণর লর্ড লিটনও প্রীত হইয়াছিলেন।

স্বরাজ্য দল—১৯২২ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বরে দেশবন্ধুর সভা-পতিত্বে গয়ায় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে কংগ্রেসের ভিতর স্বরাজ্য দল নামে একটি দল গঠিত হয়। এই দলের সভ্যরা কাউন্সিল প্রবেশের পক্ষপাতী। দেশবন্ধু এই দলের সভাপতি ও সুভাষচন্দ্র সম্পাদক নিযুক্ত হন। সুভাষচন্দ্র অতি কৃতিত্বের সহিত "ফরওয়ার্ড" ও "বাঙ্গালার কথা" নামক দুইখানি কাগজের সম্পাদনা করেন। সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে সুভাষচন্দ্রের কঠোর পরি-শ্রমের ফলে স্বরাজ্য দল নির্ব্বাচনে জয়লাভ করেন। এই বৎসর সুভাষচন্দ্র "তরুণ সঙ্ঘ" নামক একটি দল গঠন করেন।

শ্রমিক ও কৃষকদিগের অবস্থার উন্নতি করা এই দলের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।

করপোরেশনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা—১৯২৫ খৃষ্টাব্দে স্বরাজ্য দল হইতে কলিকাতা করপোরেশনে অধিকাংশ সভ্য নির্ব্বাচিত হন। দেশবন্ধু মেয়র (সভাপতি), সুভাষচন্দ্র প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা হন। প্রধান কর্ম্ম কর্ত্তার বেতন ৩০০০৲ টাকা ছিল। সুভাষচন্দ্র স্বেচ্ছায় ১৫০০৲ টাকা লন এবং এই টাকারও বেশীরভাগ তিনি গরীব ছাত্রদের দান করিতেন। সুভাষচন্দ্রের বয়স তখন ২৭ বৎসর। ইহার পূর্ব্বে করপোরেশনে সরকারি প্রভাব ছিল। এখন থেকে সকল সভ্য খদ্দর পরে আসতে লাগলেন, কলিকাতায় ভারতবর্ষের বড় লোকের নামে রাস্তা হ'তে লাগল, বড়লাট বা গভর্ণরদের পরিবর্ত্তে জাতীয় নেতাদের আগমনে নাগরিক সম্বর্ধনা জানান হতে লাগল, বিনা খরচে প্রাথমিক শিক্ষা, ঔষধপথ্য বিলি হতে লাগল।

৩ আইনে গ্রেপ্তার—যুবরাজের বয়কটে, স্বরাজ্যদলের সাফল্যে, করপোরেশনের কাজে সুভাষচন্দ্র সকলের প্রিয় হইয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্ট সুভাষচন্দ্রের এই জনপ্রিয়তা ও কাজকর্ম্ম ভালচক্ষে দেখিতেন না। বড়লাট ২৪শে অক্টোবর ৩নং রেগুলেশন আইন জারি করিয়া বাংলা সরকারকে বিনা বিচারে আটক করার ক্ষমতা দিলেন। বাংলা সরকার সুভাষচন্দ্রকে ও অন্যান্য অনেককে ২৫শে অক্টোবর গ্রেপ্তার করিলেন। গ্রেপ্তারের কারণ কিছুই জানান হয় নাই। ষ্টেটসম্যান ও

ইংলিশম্যান কাগজ সুভাষচন্দ্রকে বিপ্লবী ষড়যন্ত্রের মস্তিষ্ক বলিয়া অভিহিত করেন। ইহাতে সুভাষচন্দ্র তাহাদের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা আনেন। সুভাষচন্দ্রকে দুই মাস আলিপুর জেলে থাকিয়াই করপোরেশনের কাজকর্ম্ম চালাইতে দেওয়া হয়। তৎপরে তাহাকে বহরমপুর জেলে পাঠান হয়।

মান্দালয়ে কারাবাস—বহরমপুর হইতে সত্যেন্দ্র মিত্র প্রভৃতি সাতজন সঙ্গীসহ সুভাষচন্দ্রকে ব্রহ্মদেশের মান্দালয়ে জেলে পাঠান হয়। এইখানে লোকমান্য তিলককে ছয় বৎসর ও পাঞ্জাব কেশরী লাজপৎ রায়কে এক বৎসর কারাবাসে কাটাইতে হয়। মান্দালয় জেলে রাজবন্দীদিগকে দুর্গাপূজার খরচ দিতে গভর্ণমেণ্ট অস্বীকার করায় ১৯২৬ সালের ২০ শে ফেব্রুয়ারীতে সুভাষচন্দ্র ও অন্যান্য বন্দীরা অনশন ধর্ম্মঘট করে। ইহাতে দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলন হয়। গভর্ণমেণ্ট অবশেষে ধর্ম্মোৎসবের জন্য অর্থ মঞ্জুর করেন।

জেলে অবস্থানের কালেই দেশের লোক সুভাষকে ও সত্যেন্দ্র মিত্রকে ১৯২৬ সালে নভেম্বরে বাংলার রাষ্ট্রীয় পরিষদে সদস্য নির্ব্বাচন করেন। ইহাতে তাঁহাদের জনপ্রিয়তা প্রমাণিত হয়।

মান্দালয় জেল অস্বাস্থ্যকর জয়গা; এখানে সুভাষচন্দ্রের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া গেল, শরীরের ওজন আধমণ কমিয়া যায় এবং ক্ষয়রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। তাঁহাকে ইনসিন জেলে পাঠান হয় এবং এখানে সুভাষচন্দ্রের ভ্রাতা ডাঃ সুনীল বসু ও সরকারী ডাক্তার তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া সুভাষচন্দ্রের অবস্থা

আশঙ্কাজনক বলিয়া রিপোর্ট দেন। সেইজন্য বাংলা সরকার কতকগুলি সর্তে তাঁহাকে খালাস দিতে প্রস্তাব করেন। সুভাষচন্দ্রের মত আত্মমর্যাদাজ্ঞানী লোকের পক্ষে এইরূপ মুক্তি পাওয়া অপমানজনক। সুভাষচন্দ্র সম্মত হইলেন না। সুভাষচন্দ্রের স্বাস্থ্যের অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইতে লাগিল। অবশেষে ১৯২৭ সালে ১৬মে তারিখে তিন বৎসর পর তাঁহাকে বিনা সর্তে মুক্তি দেওয়া হয়। সুভাষচন্দ্রের মুক্তির ব্যাপার একটু রহস্যপূর্ণ। ১৫ই মে সুভাষচন্দ্রকে জাহাজে রেঙ্গুন থেকে ডায়মণ্ডহারবারে আনা হয়। সেখানে গভর্ণরের লঞ্চে তাঁহাকে নামান হয় এবং প্রসিদ্ধ ডাক্তারগণ তাঁহাকে পরীক্ষা করেন। ১৬ই মে সকালে তাঁহাকে টেলিগ্রাম করিয়া মুক্তি দেওয়া হয়। সুভাষচন্দ্রের মুক্তিতে সারা বাংলায় একদিনের জন্য দোকানপাট বন্ধ থাকে। সুভাষচন্দ্রের স্বাস্থ্যের জন্য মন্দিরে ও গৃহে প্রার্থনা করা হয় এবং শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করা হয়। ইহাতে দেশবাসীর গভীর ভালবাসা প্রমাণ হয়। গ্রেপ্তারের সময় সুভাষচন্দ্র সুস্থ, সবল ও কর্ম্মঠ যুবক ছিলেন, মুক্তির সময় কিন্তু সুভাষচন্দ্র ভগ্নস্বাস্থ্য ভগ্নোদ্যম, উঠিবার শক্তি পর্যন্ত ছিল না। মান্দালয়ের কারাবাসের এই ফল!

বাংলার নেতা—সুভাষচন্দ্রের কারাবাসের সময়ে বাংলার নেতা দেশবন্ধু দেহত্যাগ করেন। সুভাষচন্দ্রের স্বাস্থ্যলাভের পর বাংলার জনমত সুভাষচন্দ্রকে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ও বাংলার নেতা মনোনীত করেন। নভেম্বরে মাদ্রাজে

কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। সুভাষচন্দ্র ও জহরলাল কংগ্রেসের সাধনার সম্পাদক নিযুক্ত হন।

নেহেরু কমিটি—ভারতে কি প্রকার শাসনতন্ত্র চালু হবে তাহা স্থির করিবার জন্য পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠিত হয়। নাম নেহেরু কমিটি। এই কমিটি পূর্ণ স্বাধীনতা না মানিয়া ঔপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসন মূল নীতি-রূপে মানিয়া লন। ইহাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যেই অংশীদার রূপে ভারতবর্ষকে থাকিতে হইবে। লক্ষৌতে সর্ব্বদলের একটি সম্মেলন হয়। তাহাতে অধিকাংশের মতে নেহেরু কমিটির স্বায়ত্বশাসন প্রস্তাব পাশ হয় কিন্তু সুভাষচন্দ্র, জহরলাল প্রভৃতি চরমপন্থীদল ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া "**স্বাধীনতা সঙ্ঘ**" নামক একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করিবার স্থির করেন। সুভাষচন্দ্র এই প্রথম কংগ্রেসের বিরুদ্ধাচরণ করেন।

সাইমন কমিশন বয়কট—এই বৎসর বিলাত হইতে সাইমন সাহেবের নেতৃত্বে একটি রাজকীয় কমিশন ভারতে আসে। ইহার উদ্দেশ্য ছিল—ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা আলোচনা করা এবং ভারতকে কতটা দায়িত্বপূর্ণ শাসনভার দেওয়া যায় তাহা স্থির করা। কংগ্রেস এই কমিশনকে বয়কট করিবার প্রস্তাব করে। ১৯২৮ সালের ৩রা ফেব্রয়ারীতে ভারত "সাইমন ফিরিয়া যাও" বলিয়া বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। স্কুল-কলেজ দোকান-পাট বন্ধ হয়।

১৯২৮-সাল—১৯২৮ সালের মে মাসে সুভাষচন্দ্র সবরমতী

আশ্রমে মহাত্মাজীর সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহাকে পুনরায় আইন অমান্য আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন কিন্তু মহাত্মা বলেন, "আমি ভগবানের কোন নির্দ্দেশ পাইতেছি না।"

১৯২৮ সালের মে মাসে সুভাষচন্দ্র পুণাতে মহারাষ্ট্র প্রাদেশিক কনফারেন্সে সভাপতিত্ব করেন।

১৯২৮ সালে ডিসেম্বরে সুভাষচন্দ্র ভারতীয় যুব কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন। এই কংগ্রেসে তিনি প্রথম গান্ধীজীর মতের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেন।

কলিকাতা কংগ্রেস—১৯২৮ সালে কলিকাতায় মতিলাল নেহরুর সভাপতিত্বে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। সুভাষচন্দ্র স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর নেতা হন।

এই কংগ্রেসে উগ্রপন্থী দল ও নরমপন্থী দলের মধ্যে বিরোধ প্রবল হয়। উগ্রপন্থীদল চান—ব্রিটিশের সঙ্গে সকল সম্পর্ক বিচ্ছেদ করিয়া পূর্ণ স্বাধীনতা; এই দলে সুভাষচন্দ্র, জহরলাল ছিলেন। নরমপন্থীদল চান—ঔপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসন অর্থাৎ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরে থাকিতে। এই দলে মতিলাল, মহাত্মা গান্ধী ছিলেন। মহাত্মাজী একটি প্রস্তাব করেন, "যদি ১৯২৯ সালের মধ্যে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট নেহরু কমিটির রিপোর্ট মানিয়া লয় অর্থাৎ স্বায়ত্ব-শাসন দেয়, ভারত তাহা গ্রহণ করিবে; যদি তাহা না হয় তবে কংগ্রেস ১৯২৯ সালের শেষে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করিবে"। সুভাষচন্দ্র 'পূর্ণ স্বাধীনতার' সংশোধন প্রস্তাব আনায়ন করেন কিন্তু সুভাষের প্রস্তাব ১৩৫০-

৯৭৩ ভোটে অগ্রাহ্য হয়। এই বৎসরে ৩০শে ডিসেম্বরে সুভাষ **হিন্দুস্থান সেবাদলের** সভাপতিত্ব করেন। কংগ্রেসের পরই সুভাষচন্দ্র, জহরলাল প্রভৃতি **স্বাধীনতা-সঙ্ঘ** প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২৯হইতে ১৯৩১ খৃস্টাব্দ পর্য্যন্ত সুভাষচন্দ্র ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি হন। ইহা ভারতীয় কলের মজুরদের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান।

জহরলালের দলত্যাগ—১৯২৯ সালের লাহোরে কংগ্রেসের দিন এগিয়ে আসতে লাগল। এদিকে গভর্ণমেণ্টের তরফ থেকে কংগ্রেস প্রস্তাবের কোন সাড়াশব্দ নাই। মহাত্মা কংগ্রেসে সুভাষের ও জহরলালের নেতৃত্বে চরমপন্থী দলের সংখ্যা ও তরুণদের প্রতিপত্তি যে বেড়ে যাচ্ছে এবং তাঁহার প্রতিপত্তি যে কমে যাচ্ছে কলিকাতা কংগ্রেসে ইহা লক্ষ্য করে বিচলিত হলেন। ১৯২৯ সালে অক্টোবরে সুভাষ লাহোরে যুব-সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন এবং বিপুল ভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। এই লাহোরেই কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে। এই সকল চিন্তা মহাত্মাকে অধিক বিচলিত করিল। গান্ধীজি জহরলালকে নিজের দলে টানবার চেষ্টা করতে লাগলেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি জহরলালকে লাহোর কংগ্রেসের সভাপতি মনোনীত করাইলেন। সেই অবধি জহরলাল সুভাষচন্দ্রের উগ্রপন্থীদল ত্যাগ করিয়া মহাত্মার দলে যোগদান করিলেন এবং আজ পর্যন্ত মহাত্মারই বিশ্বস্ত অনুচর আছেন।

বাংলায় পুনর্নির্ব্বাচন—১৯২৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিলে বাংলার গভর্ণর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা ভাঙ্গিয়া দেন এবং পুনঃ নির্ব্বাচনের

আদেশ দেন। সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে জুন মাসে কংগ্রেস প্রার্থীরা বিপুল ভোটাধিক্যে মনোনীত হন।

কারাদণ্ড—১৯২৯ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে সুভাষচন্দ্র "নিখিল ভারত লাঞ্ছিত রাজনৈতিক দিবস" পালন উপলক্ষ্যে এক শোভাযাত্রা পরিচালনা করেন। সেইজন্য সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগে মামলা আনা হয়। ১৯৩০ খৃস্টাব্দে ২৩শে জানুয়ারীতে সুভাষচন্দ্রের ৯ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

১৯২৯ খৃষ্টাব্দে ১৩ই সেপ্টেম্বর লাহোর জেলে যতীনদাস ৬৩ দিন অনশন করিয়া মারা যান। তাঁহার মৃতদেহ কলিকাতায় আনা হইলে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে এক বিরাট শোভাযাত্রা হয়। ২৯ সেপ্টেম্বরে সুভাষচন্দ্র হাওড়ায় রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন।

আরউইনের ঘোষণা—১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ৩১ অক্টোবরে বড়লাট আরউইন কংগ্রেসকে জানান যে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ব শাসনই ভারতের ভাবী শাসনতন্ত্র বলিয়া ঘোষণা করেন এবং সাইমন কমিশনের রিপোর্ট বাহির হইলেই লণ্ডনে একটি গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করা হইবে। এই ঘোষণার পর দিল্লীতে সর্ব্বদলীয় কনফারেন্স হয়। ইহাতে মতিলাল, মদনমোহন, জহরলাল, সরোজিনী নাইডু প্রভৃতি অনেকে বড়লাটের ঘোষণা ও ভারতের স্বায়ত্বশাসনের বিস্তারিত আলোচনার জন্য গোলটেবিল বৈঠকের সমর্থন করিয়া এক বিবৃতি দেন। সুভাষ, কিচলু প্রভৃতি কয়েকজন পৃথক বিবৃতি দিয়া ইহার বিরোধিতা করেন। ইহার

পর গান্ধীজি ও মতিলাল বড়লাটের সঙ্গে দেখা করেন কিন্তু হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসেন। সুভাষচন্দ্র এইরূপ ভিক্ষাবৃত্তি ও আপোষকরার বরাবরই বিরোধী। তিনি জীবনে কখনও কোন বড়লাট বা গভর্ণরের সঙ্গে দেখাকরেন নাই কারণ তিনি বিশ্বাস করেন স্বাধীনতা কখনও কেহ কাহাকে স্বেচ্ছায় দেয় না। আপোষ করে স্বাধীনতা পাওয়া যায় না।

লাহোর কংগ্রেস—লাহোর কংগ্রেসে মহাত্মা নিজেই 'পূর্ণ স্বাধীনতা' প্রস্তাব উত্থাপন করেন। লাহোর কংগ্রেসেও সুভাষচন্দ্র ও মহাত্মা চালিত নরমপন্থীদলের মধ্যে মতভেদ সুস্পষ্ট হয়। আরউইনের ট্রেণে বোমা ফেলা হয় এবং তিনি কোন প্রকারে বাঁচিয়া যান। মহাত্মা আরউইনের নিষ্কৃতির জন্য সমবেদনাজ্ঞাপক একটি প্রস্তাব করেন। সুভাষের দল ইহাতে আপত্তি করেন। সুভাষচন্দ্র লাহোর কংগ্রেসে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে পূর্ণভাবে বয়কট করিয়া পাশাপাশি জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিবার এবং শ্রমিক, কৃষক ও যুবকদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার প্রস্তাব করেন। উহা ভোটে অগ্রাহ্য হয়।

সুভাষচন্দ্র তরুণ সম্প্রদায়ের নেতা হন এবং পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য জোর আন্দোলন চালান এবং দেশকে স্বায়ত্বশাসনের প্রস্তাবে সন্তুষ্ট থাকিতে নিষেধ করেন।

একটা জিনিষ লক্ষ্য করা যায় যে সুভাষচন্দ্র চিন্তায় সকলের অগ্রগামী ছিলেন। কলিকাতার কংগ্রেসে সুভাষের স্বাধীনতা প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয় এবং পর বৎসর লাহোর কংগ্রেসে উহাই

গৃহীত হয়। লাহোরে সুভাষের আইন অমান্য আন্দোলন 'প্রস্তাব প্রত্যাখাত হয়, পর বৎসর কংগ্রেসে উহাই গৃহীত হয়। পরে দেখা যাইবে ত্রিপুরী কংগ্রেসে "ভারত ছাড়" প্রস্তাব প্রত্যাখাত এবং ১৯৪২ সালের কংগ্রেসে তাহাই যাদুমন্ত্ররূপে গৃহীত হয়। লাহোরে সুভাষচন্দ্র প্রস্তাব করেন যে কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির সভ্য সভাপতির দ্বারা মনোনীত না হইয়া গণতন্ত্রের ভিত্তিতে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির দ্বারা নির্ব্বাচিত হউক। এই প্রস্তাবও প্রত্যাখাত হয়। কয়েক বৎসর পর আবার এই প্রস্তাবই গৃহীত হয়। লাহোর কংগ্রেসে শেষোক্ত প্রস্তাব প্রত্যাখাত হওয়ায় সুভষচন্দ্রের দল কংগ্রেসের প্যাণ্ডেল ত্যাগ করিয়া যান এবং দশ মিনিটের মধ্যে কংগ্রেস গণতান্ত্রিক নামক একটি দল গঠন করেন। ইহা গণতন্ত্রনীতির বিরোধী যে সভাপতি নিজের মনোমত সভ্য নিয়োগ করিবেন। সভাপতি জহরলাল সুভাষের দলের শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারকে এবং সুভাষকে কার্যকরী সমিতির মধ্যে গ্রহণ করিলেন না। আয়েঙ্গার দেশ প্রেমিক এবং মাদ্রাজের হাইকোর্টের Advocate Generalএর পদ ত্যাগ করেন। তিনি ১৯২৬ সালের কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। এইরূপ লোককেও কার্যকরী সমিতির সভ্য করা হয় নাই। ইহার পর আয়েঙ্গার চিরজীবনের মত কংগ্রেস ত্যাগ করেন।

বাংলায় বিরোধ—দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন ও সুভাষচন্দ্র দুই জনই দেশবন্ধুর প্রিয় অনুচর। দেশবন্ধুর মৃত্যুর সময় সুভাষচন্দ্র

কারাগারে ছিলেন। সেইজন্য দেশপ্রিয় বাংলার নেতা হন। তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি ও করপোরেশনের পাঁচ বার মেয়র হন। সুভাষের মুক্তির পরে বাংলার নেতৃত্ব লইয়া সুভাষচন্দ্র ও দেশপ্রিয়ের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হয়। এই ব্যাপার লইয়া অনেক তিক্ততা প্রকাশ পয়। কংগ্রেস মিঃ এম,এস,এ্যনেকে বিবাদ মিটাইবার জন্য সালিশী নিযুক্ত করেন। কলিকাতায় মহারাষ্ট্র ভবনে সালিশী বসিত। ব্যারিষ্টার নিশীথসেন সেনগুপ্তের দিকে ও ব্যারিষ্টার শরৎ বসু সুভাষের দিকে মামলা পরিচালনা করেন। অনেক দিন পর বিবাদ মিটিয়া যায়। সুভাষচন্দ্র লাহোরে যুবক, শ্রমিক ও কৃষকদিগের সভায় অনেক বক্তৃতা করেন এবং সকলেই তাঁহাকে সমর্থন করেন।

তিনবার কারাদণ্ড—ইহার পরে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হয়। সুভাষচন্দ্র, সেনগুপ্ত, সত্যরঞ্জন বক্সী, কিরণ শঙ্কর প্রভৃতি নেতাদের কারাদণ্ড হয়। সুভাষের নয় মাস কারাদণ্ড হয়। তাঁহারা আলিপুর জেলে আবদ্ধ থাকেন। এখানে একটি ঘটনা ঘটে। ২৭ শে এপ্রিল সকালে মেছুয়াবাজার বোমার মামলার আসামীরা হাজতে দুর্ব্বিবহারের প্রতিবাদে কয়েদীর গাড়ীতে উঠিতে অস্বীকার করে। জেলের কর্তৃপক্ষের আদেশে কতকগুলি পাঠান তাঁহাদিগকে জোর করিয়া গাড়ীতে উঠাইতে যায়। সুভাষচন্দ্র ও অন্যান্য রাজবন্দী ইহাতে আপত্তি করেন। তখন একজন পাঠান সুভাষচন্দ্রকে লাঠি দিয়া আঘাত করে। সুভাষচন্দ্র একঘণ্টা অজ্ঞান অবস্থায় থাকেন। ইহাতে দেশব্যাপী

তুমুল আন্দোলন হয়। ইহার ফলে জেলকর্ত্তাকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হয়।

সুভাষচন্দ্র জেলে থাকা কালেই করপোরেশনের মেয়র নির্ব্বাচিত হন। মুক্তির পর তিনি Trade Union Congressএর সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারীতে মালদহ জেলায় সাত দিনের জন্য সুভাষের কারাদণ্ড হয়। লাহোর কংগ্রেসের পর প্রত্যেক বৎসর ২৬শে জানুয়ারী শোভাযাত্রা করিয়া ও স্বাধীনতা সঙ্কল্প বাক্য পাঠ করিয়া 'স্বাধীনতা' দিবস পালিত হয়। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে এইরূপ শোভাযাত্রা করাতে সুভাষের ও এগার জনের ছয় মাস কারাদণ্ড হয়।

গান্ধী আরউইন প্যাক্ট—লণ্ডনে প্রথম গোল টেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের কোন প্রতিনিধি না থাকায় উহা ব্যর্থ হয়। গভর্ণমেণ্ট দমন নীতি অবলম্বন করিয়া এবং সমস্ত নেতাকে কারাগারে পাঠাইয়াও কোন প্রকারে আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করিতে পারিলেন না। উদার নৈতিক দলের তেজ বাহাদুর সপ্রু ও জয়াকরের মধ্যস্থতায় গভর্ণমেণ্ট কংগ্রেসের সঙ্গে একটা আপোষ মীমাংসা করার জন্য সকল নেতাকে ও রাজনৈতিক বন্দীদের বিনা সর্ত্তে মুক্তি দেন। এই সর্ত হয় যে মহাত্মা গান্ধী সাময়িক ভাবে আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করিবেন এবং লণ্ডনে গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিবেন। ইহাই বিখ্যাত গান্ধী—আরউইন প্যাকট। চরমপন্থী দল এই চুক্তির বিরুদ্ধে ছিলেন।

সর্দ্দার ভাগত সিং পাঞ্জাব বোমা মামলার আসামী ছিলেন। কংগ্রেসের উগ্রপন্থীদল ভাগত সিংহের মুক্তির জন্য গান্ধীকে অনুরোধ করিলেন কিন্তু উহা পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্টের ব্যাপার বলিয়া বড়লাট কিছুতেই রাজী হলেন না। ইহাতে তরুণ সম্প্রদায় গান্ধীর উপর খুব অসন্তুষ্ট হইলেন। করাচিতে কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় তরুণ সম্প্রদায় ভারতীয় নবযুয়ান (Najuan) কনফারেন্স আহ্বান করেন। সুভাষ ইহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কংগ্রেস অধিবেশনের পূর্ব্বেই ভাগত সিং ও শুকদেব সিংএর ফাঁসি হইয়া যায়। এই সংবাদে সমস্ত দেশ ক্ষেপিয়া উঠে। করাচিতে গান্ধীজীকে কাল নিশান দেখান-হয় এবং ঢিল ছোঁড়া হয়। নবযুয়ান কনফারেন্স গান্ধীজীর আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করার নীতিকে নিন্দা করা হয়।

প্রতিবাদ—হিজলী বন্দীশালায় গুলি চালনার ফলে দুইজন রাজবন্দী নিহত হন। সুভাষচন্দ্র ইহার প্রতিবাদে করপোরেশনের অলড্যারম্যানের পদত্যাগ করেন।

হাজতবাস—বিলাতে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকের পর মহাত্মা হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসেন। ১৯৩১ সালে ২৯ শে ডিসেম্বর বোম্বাইতে কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতির অধিবেশন হয়। সুভাষ এই অধিবেশনে যোগদান করিতে আমন্ত্রিত হন যদিও তিনি সভ্যপদ ত্যাগ করেন। বোম্বাই হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে তিনি কল্যান ষ্টেশনে গ্রেপ্তার হন। কয়েক মাস বিভিন্ন জেলে

আটক থাকায় তাঁর স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া যায়। অবশেষে গভর্ণমেণ্ট সুভাষকে চিকিৎসার জন্য ইউরোপে যাইতে অনুমতি দেয়। কিন্তু তিনি সেখানেও অবাধ স্বাধীনতা পান নাই এমন কি ইউরোপে যাইবার সময় তাঁহাকে মাবাপের সহিত দেখা করিতে দেওয়া হয় না।

ইউরোপ ভ্রমণ—১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে ২৩ শে ফেব্রুয়ারী সুভাষচন্দ্র ইউরোপ যাত্রা করেন এবং ৮ই মার্চ্চ ভিয়েনায় পৌঁছান। ভিয়েনা সহরের পৌর ব্যবস্থা দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হন। ভিয়েনা পৃথিবীর মধ্যে একটি সুন্দর সহর। তিনি কলিকাতা সহরের ব্যবস্থাতে ঐ সব প্রণালী প্রবর্ত্তন করিতে মনস্থ করেন। তিনি ভিয়েনায় সৈন্যদের কুচকাওয়াজে উপস্থিত ছিলেন। তাহাদিগের নিয়মানুবর্তিতা দেখিয়াও তিনি মুগ্ধ হন।

অনেক ভারতবাসী বিদেশে যাইয়া স্ফুর্ত্তি করিয়া বাজে কাজে সময় ও অর্থের অপব্যয় করেন। স্বাধীন দেশে আমাদিগের অনেক শিখিবার বস্তু আছে। সে সব দেশের তুলনায় শিক্ষায়, চরিত্রে, শিল্পে, কৃষিবিদ্যায়, রাজনীতিতে সর্ব্ব বিষয়ে আমরা কত পশ্চাতে পড়িয়া আছি তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। সুভাষ চন্দ্র যেখানেই গিয়াছেন সেখানেই ভারতের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন।

এই সময়ে ভারতীয় রাষ্ট্রপরিষদের সভাপতি পরলোকগত বিঠল ভাই প্যাটেল ভিয়েনায় চিকিৎসার জন্য গমন করেন। দুইজন নেতা একসঙ্গে ছিলেন এবং সুভাষচন্দ্র প্যাটেলের মৃত্যু

পর্য্যন্ত সেবা করেন। ইহারা উভয়ই ১৯৩৩ সালে ৯ই মে গান্ধীজিকে রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। প্যাটেল ভারতের বাহিরে স্বাধীনতার আন্দোলন চালাইবার জন্য সুভাষের নামে এক লক্ষ টাকা উইল করিয়া যান। প্যাটেলের মৃত্যুর পর সুভাষ তাঁহার মৃতদেহ ভারতে পাঠাইয়া দেন। ভগ্নস্বাস্থ্য স্বত্ত্বেও সুভাষচন্দ্র বিদেশে ভারতের পক্ষে অনেক আন্দোলন করেন যদিও ইউরোপে তাঁহাকে অনেকটা নির্ব্বাসিতের মত জীবন যাপন করিতে হয়। ইংলণ্ড, রাশিয়া, জার্মেনি ও যুক্তরাষ্ট্রে যাইবার অনুমতি ছিল না।

লণ্ডনে ভারতীয়দের একটি সম্মেলনে সুভাষকে সভাপতিত্ব করার জন্য আমন্ত্রণ করা হয় কিন্তু ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট অনুমতি না দেওয়ায় সুভাষচন্দ্র লণ্ডনে যাইতে পারেন নাই। ডাঃ ভাট তাঁহার লিখিত অভিভাষণ পাঠ করেন।

১৯৩৩ সালে সুভাষ প্রাগ সহরে যান। সেখানে প্রাগের মেয়র সুভাষকে বিপুলভাবে অভ্যর্থনা করেন। তিনি জেনেভায় কিছুদিন ছিলেন। তিনি ফ্রান্স ও ইটালিতেও ভ্রমণ করেন। তিনি রোমে কিছুদিন থাকেন। পরে সোফিয়া,বুদাপেষ্ট, বুখারেষ্টে ভারত সম্বন্ধে অনেক বক্তৃতা করেন। বেলগ্রেডে ব্রিটিশ রাজদূত তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করেন, অন্যক্ষেত্রে ব্রিটিশের প্রতিনিধি তাঁহার কার্য্যকলাপের উপর কড়া নজর রাখিতেন।

পিতার মৃত্যু—১৯৩৪ সালে সুভাষের পিতা অসুস্থ হইয়া

পড়েন। তিনি বিমানযোগে ৩রা ডিসেম্বর করাচি হইয়া দমদম পৌঁছান, কিন্তু জানকীনাথ পুত্রের পৌঁছিবার পূর্ব্বেই মারা যান। সুভাষ তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় যোগদান করেন। সুভাষচন্দ্র কয়েকটি সর্ত্তে স্বগৃহে অন্তরীণ থাকেন। ১৯৩৫ সালের ১০ই জানুয়ারী তিনি পুনরায় ইউরোপ যাত্রা করেন।

ইউরোপ ভ্রমণ—ইউরোপের প্রথম ভ্রমণের পর সুভাষচন্দ্র Indian Struggle নামক একখানি অতি মূল্যবান পুস্তক রচনা করেন। ইহা লণ্ডনে প্রকাশিত হয়। ইহাতে অন্য বিষয় ব্যতীত তাঁহার ইউরোপের বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞতা বর্ণিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় ভ্রমণে তাঁহার রাজনৈতিক মতের অনেক পরিবর্ত্তন হয়। তিনি নেপলস, রোম, ভিয়েনা, জেনেভা ও প্যারি সহরে অবস্থান করেন। রোমে আফগানিস্থানের নির্ব্বাসিত আমীরের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের দেখা হয়।

বিদেশে অবস্থান কালে সুভাষচন্দ্র একটি বিষয়ে বিশেষ প্রতিবাদ করেন। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি ও বেতনভুক চরেরা বিদেশে ভারতের মিথ্যা ও কুৎসিৎ বিবরণ দিয়া থাকেন— যেমন "ভারতে অস্পৃশ্যতাই একমাত্র সমস্যা, ভারতে বিধবাদের জীবন্ত দগ্ধ করা হয়, মেয়েদের পাঁচ ছয় বৎসরে বিবাহ দেওয়া হয়, লোকেরা কাপড় পরিতে জানে না।" বক্তৃতার জায়গায় কাল বর্ণের অর্ধ উলঙ্গ ভারতবাসীর ছবি দেখান হয়। মাসিক পত্রিকায় নানাপ্রকার কুৎসাপূর্ণ প্রবন্ধ বাহির হয়। ভিয়েনার একখানি ছবির পুস্তকে একটি সাধুর মৃতদেহ রাস্তায় কয়েকদিন

পড়িয়া আছে এইরূপ ছবি আছে। এই ছবির নীচে লেখা আছে যে সাধারণ লোকে সাধুর মৃত দেহ স্পর্শ করে না। বায়স্কোপে ভারতের কুৎসাকারী ছবি দেখান হয়। 'Bengali' নামক ছবিতে দেখান হয় ব্রিটিশ ভারতের ত্রাণকর্ত্তা। আর একটি ছবিতে দেখান হয় যে মহাত্মা অর্দ্ধ উলঙ্গ অবস্থায় একটি ইউরোপীয় মেয়ের সঙ্গে নৃত্য করছেন। এই সকল অপকর্ম্মের বিরুদ্ধে সুভাষচন্দ্র বিশেষ প্রতিবাদ করেন।

১৯২৬ সালে তিনি আয়র্ল্যাণ্ডে ডি ভ্যালেরা ও অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই সাক্ষাতে উভয় দেশের মধ্যে সৌহার্দ্য বর্দ্ধিত হয়। ডি ভ্যালেরা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি খুব সহানুভূতি প্রকাশ করেন। ভারতীয় ছাত্র ও অধ্যাপক যাহাতে আয়র্ল্যাণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠের সুবিধা পান তদ্বিষয়ে সুভাষচন্দ্র ডি ভ্যালেরার নিকট অনুরোধ করেন।

ভারতে আগমন ও গ্রেপ্তার—১৯৩৬ সালে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে যোগদান করিবার জন্য সভাপতি জহরলাল জনমতের অভিপ্রায় অনুসারে সুভাষকে ভারতে আগমনের আমন্ত্রণ জানান। ভারত সরকার ইহা জানিতে পারিয়া ভিয়েনার ব্রিটিশ রাজদূত মারফৎ সুভাষচন্দ্রকে জানাইয়া দেন যে যদি সুভাষ ভারতে ফেরেন তবে তাঁহাকে স্বাধানভাবে থাকিতে দেওয়া হইবে না। সুভাষ এই অন্যায় ব্যবহারের প্রতিবাদে সতর্কবাণী অগ্রাহ্য করিয়াই কন্টিভার্ড জাহাজে রওনা হন। ১১ই এপ্রিল বোম্বাই পৌঁছান

মাত্রই তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং যারবেদা জেলে পাঠান হয়। এই অন্যায় গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলন হয়। কংগ্রেসও ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। ভারতীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদে মুলতুবি প্রস্তাব আনা হয়। গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ১০ই মে "নিখিল ভারত সুভাষ দিবস" পালিত হয়। বিলাতেও পার্লামেণ্টে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হয়। ২০শে মে সুভাষকে যারবেদা জেল হইতে কার্সিয়াংএর গির্দ্দা পাহাড়ে শরৎচন্দ্রের বাড়ীতে অন্তরীণ রাখা হয়। সেখান হইতে চিকিৎ-সার জন্য তাঁহাকে ১৭ই ডিসেম্বর কলিকাতায় মেডিক্যাল কলেজ হাঁসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। অবশেষে সুভাষচন্দ্রকে ১৯৩৭ সালে ১৭ই মার্চ্চ সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর পর বিনাসর্ত্তে মুক্তি দেওয়া হয়।

স্বাস্থ্যোন্নতি—তিনি একমাস ডাঃ নীল রতন সরকারের চিকিৎসায় থাকেন। ১লা মে তিনি পাঞ্জাবের ডালহৌসী নামক স্থানে যাত্রা করেন। ডালহৌসীতে ডাঃ ধরমবীরের গৃহে অবস্থানের পর ৭ই অক্টোবর কলিকাতায় ফেরেন। এই সময় তাঁহার স্বাস্থ্যের অনেক উন্নতি হয়। তিনি কিছুদিন কার্শিয়াংতে থাকার পর ১৮ই নভেম্বর স্বাস্থ্য লাভের জন্য পুনরায় তৃতীয়বার ইউরোপ ভ্রমণ করেন। তিনি অষ্ট্রিয়ায় বাদ্‌গাস্তিনে প্রায় ছয় সপ্তাহ চিকিৎসা করান। এইবার তাঁহার সর্ব্বত্র অবাধ গতিবিধি ছিল। তিনি লণ্ডনে বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হন এবং প্রথম বক্তৃতা দেন।

হরিপুরা কংগ্রেস—১৯৩৮ সালের কংগ্রেস সভাপতির জন্য বিভিন্ন প্রদেশ হইতে চারজনের নাম প্রস্তাবিত হয়—সুভাষ চন্দ্র, মৌলানা আজাদ, জহরলাল, আবদুল গফরখান। সুভাষচন্দ্রের দেশের জন্য স্বার্থত্যাগের হেতু বাকী তিনজন সুভাষচন্দ্রের অনুকুলে নাম প্রত্যাহার করেন। সুভাষচন্দ্রই সভাপতি মনোনীত হন। ১৯৩৮ সালের ১৪ই জানুয়ারী তিনি বিমানে দেশে পৌঁছান।

তাপ্তীনদীর তীরে হরিপুরা গ্রামে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। মহাত্মার নির্দ্দেশে এই প্রথম গ্রামে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। সভাপতিকে গ্রাম্য কায়দায় অভ্যর্থনা করা হয়। প্যাটেলের স্মৃতির জন্য কংগ্রেসের জায়গাটার নাম হইয়াছিল 'বিঠল নগর'। ইহা কংগ্রেসের ৫১ তম অধিবেশন সেইজন্য প্যাণ্ডালে ৫১টি গেট ছিল, ৫১টি জাতীয় পতাকা উড্ডীন ছিল। সভাপতিকে ৫১টি বলদ চালিত সুসজ্জিত রথে শোভাযাত্রা করিয়া আনা হয়। রথের পশ্চাতে ছয়টি গরুর গাড়ীতে নেতারা ছিলেন। একদল বাসন্তী রঙের শাড়ী পরিহিতা বালিকা সভাপতির কপালে কুম্‌কুম্‌ পরাইয়া তাঁহাকে বন্দনা করে। শোভাযাত্রায় প্রতি সারে দশ জন লোক ছিল এবং শোভাযাত্রাটি বার মাইল দীর্ঘ হইয়াছিল। বিঠল নগরে প্রায় আড়াই লক্ষ লোকের সমাবেশ হয়। সুভাষচন্দ্র সারাজীবন দেশের জন্য দুঃখ নির্য্যাতন বরণ করেছেন। সেইজন্য দেশবাসী তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ সম্মান দেখাইলেন। তখন সুভাষচন্দ্রের বয়স মাত্র ৪১ বৎসর।

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে সুভাষচন্দ্রের প্রথমবার সভাপতি থাকা কালে নিম্নলিখিত ঘটনাগুলি উল্লেখযোগ্য :—(১) উড়িষ্যা, বিহার, যুক্তপ্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিগণের সহিত গভর্ণরের মতভেদ হওয়ায় গভর্ণরের পরাজয়। (২) পার্লামেণ্টারি কার্য্যকলাপে কংগ্রেসের মর্য্যাদা বৃদ্ধি। (৩) ভারতের আটটি প্রদেশে কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা শাসন ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। (৪) আসামে কংগ্রেস কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন। (৫) বহু দেশীয় রাজ্যে কংগ্রেসের নীতি অনুযায়ী অহিংস গণ আন্দোলন আরম্ভ হয়। (৬) হিন্দু মুশলিমের মিলনের জন্য সুভাষচন্দ্র জিন্নার সহিত আলোচনা চালান। (৭) কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি দীর্ঘকালব্যাপী বাঙ্গালী-বিহারি বিরোধের সমস্যার সমাধান করেন; যথা (ক) বিহারী ও বাঙ্গালীর মধ্যে কোন ব্যাপারে কোনরূপ বৈষম্য থাকিবে না। (খ) বিহারে দীর্ঘকাল বাস করিবার প্রমাণের যে সার্টিফিকেট (Domiciled certificate) লইবার প্রথা ছিল তাহা রহিত হয়। যে কোন ব্যক্তি দশ বৎসর বাস করিলে ঐ প্রদেশে বাসিন্দা বলিয়া গণ্য হইবেন। (গ) ভারতবাসীকে একটি অখণ্ড জাতি হিসাবে গণ্য করার নীতি গৃহীত হয়। (ঘ) ছাত্রসংখ্যা যথোপযুক্ত হইলে সেই ছাত্রদিগেরও মাতৃ ভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

১৩৪৫ সালে ৭ই মাঘ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ রাষ্ট্রপতিকে শান্তিনিকেতনে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধনা করেন এবং আম্রকুঞ্জে একটি মহতী সভায় তাহাকে অভিনন্দন করেন।

ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচন ১৯৩৯ সালে কংগ্রেসের ৫২তম অধিবেশন ত্রিপুরীতে হয়। এই অধিবেশনে সভাপতি নির্ব্বাচন, কংগ্রেসের অধিবেশন ও পরের ঘটনাবলী সুভাষচন্দ্রের জীবনে বড়ই বেদনাদায়ক। সুভাষচন্দ্রের মত ত্যাগী দেশ-প্রেমিক নেতার প্রতি কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতাদের এ আচরণ শোভনীয় হয় নাই। নেতাদের মধ্যে মতভেদ সব দেশেই হইয়া থাকে কিন্তু ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচনের ব্যাপার লইয়া সুভাষচন্দ্র ও দক্ষিণপন্থী নেতাদের মধ্যে যে বিবাদ আরম্ভ হয় তাহা কংগ্রেসের ইতিহাসে অচিন্ত্যনীয়। সুভাষচন্দ্রের দোষ তিনি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে কোন আপোষ করিতে রাজি নন, কোন নরমপন্থা অবলম্বন করিতে রাজি নন। সুভাষচন্দ্র ছিলেন জবরদস্ত লোক। তাঁহার চরিত্র ছিল অনমনীয়। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট দেশীয় রাজ্য ও ব্রিটিশ শাসিত অঞ্চল লইয়া একটি যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্ত্তন করিতে চাহেন। সুভাষচন্দ্র ইহার ঘোর বিরোধী ছিলেন। গান্ধী প্রমুখ দক্ষিণপন্থী নেতাগণ ইহার স্বপক্ষে ছিলেন। সেইজন্য দক্ষিণপন্থী নেতাগণ সুভাষকে সভাপতি পদ হইতে তাড়াইতে চাহেন। প্রথমে বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সুভাষচন্দ্র, মৌলানা আজাদ ও ডাঃ পট্টভি সীতরামিয়ার নাম প্রস্তাব হয়। মৌলানা আজাদ অন্যান্য দক্ষিণপন্থী নেতাগণের পরামর্শে সীতারামিয়াকে সুপারিশ করিয়া নিজের নাম প্রত্যাহার করেন এবং এক বিবৃতি দেন। সুভাষচন্দ্র এক পাল্‌টা বিবৃতি দিয়া তাঁহার বক্তব্য বলেন। সভাপতি সুভাষ বসুরই নিয়োজিত ওয়ার্কিং

কমিটির ছয়জন সদস্য সুভাষচন্দ্র যাহাতে নির্ব্বাচিত না হন এবং ডাঃ পট্টভি নির্ব্বাচিত হন কংগ্রেস ডেলিগেটদের নিকট এইরূপ আবেদন করিয়া এক বিবৃতি দেন। এইরূপ বিবৃতি ও পাল্টা বিবৃতি দেওয়ায় ডেলিগেটগণ বুঝিতে পারিলেন সুভাষ-চন্দ্রই ঠিক পথে চলিতেছেন এবং তাঁহার একটা অনুমোদিত নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপন্থা ও নীতি আছে এবং তিনি যুক্তরাষ্ট্র বিরোধিতা করিবেন। সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষকে অন্য কোন যুক্তরাষ্ট্র বিরোধী বামপন্থী নেতাকে সভাপতি করিতে অনুরোধ জানান। কংগ্রেসের মধ্যে দলাদলি সৃষ্টি বন্ধ করিবার জন্য সর্ব্বশেষে তিনি বামপন্থীদের বিশ্বাসভাজন একজন দক্ষিণপন্থীকে সভাপতি করিতে বলেন। ইহাতে কেহই কর্ণপাত করিলেন না কারণ দক্ষিণপন্থীরা জানিতেন যে তাঁহারাই ভোটে জিতিবেন। যাহা হউক ২৯শে জানুয়ারীতে ভোট গ্রহণ হয়। সুভাষচন্দ্র ১৫৮০ ভোট ও পট্টভি ১৩৭৭ ভোট পান। দক্ষিণপন্থী নেতাদের বিরুদ্ধাচরণ সত্ত্বেও সুভাষ চন্দ্র সকলকে বিস্মিত করিয়া ২০৩ ভোট বেশী পাইয়া সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। ইহাতে প্রমাণ হয় সুভাষকে দেশের লোক কতটা সমর্থন করে।

সভাপতি নির্ব্বাচনের পর—সভাপতি নির্ব্বাচনের পরও যে সকল ঘটনা ঘটে তাহা শোভনীয় হয় নাই। সুভাষচন্দ্র নির্বাচনের ফলাফল সম্বন্ধে বলেন, "আমাদের জয়লাভে নীতি ও আদর্শের জয় হইয়াছে। কংগ্রেসে কোন দলাদলি হইতে দিব না। কংগ্রেস পূর্ব হইতেই ঐক্য বদ্ধ আছে। কংগ্রেসীদের

মধ্যে মতভেদ থাকিতে পারে কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমরা সকলেই একমত……আমি ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানবের আস্থাভাজন হইতে চেষ্টা করিব।"

মহাত্মা গান্ধী নির্বাচন সম্বন্ধে এক বিবৃতি দেন, "আমি গোড়া হইতে তাঁহার (সুভাষচন্দ্রের) নির্বাচনের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলাম। কারণ বর্ণনার প্রয়োজন নাই।...আমার চেষ্টাতেই ডাঃ পট্টভি নির্ব্বাচন হইতে সরিয়া দাঁড়ান নাই। অতএব এই পরাজয় তাঁহার অপেক্ষা আমারই অধিক।...সংখ্যালঘুদের দ্বারা কোন রূপ বাধা সৃষ্টি করা উচিত হবে না। যখন তাঁহারা সহযোগিতা করিতে অসমর্থ হইবেন তখন তাঁহারা সহযোগিতা হইতে বিরত থাকিবেন।...

মহাত্মার এই বিবৃতির পরে ত্রিপুরী অধিবেশনের পূর্ব্বেই ওয়ার্কিং কমিটির বার জন সদস্য সুভাষচন্দ্রের নিকট পদত্যাগ পত্র দাখিল করেন। জহরলাল পৃথক পত্রে পদত্যাগ করেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল সুভাষচন্দ্রকে তাঁহার সুস্পষ্ট নীতি অনুসরণে এবং নিজ দল হইতে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য নির্ব্বাচনে স্বাধীনতা দেওয়া। এই সময়ে সুভাষচন্দ্র ১০৩° জরে শয্যাগত, উত্থান শক্তি রহিত। ডাক্তাররা তাঁহাকে কোন কার্য্য করিতে পরামর্শ দেন নাই। এই সঙ্কট মুহূর্ত্তে বারজন সভ্যের পদত্যাগ পত্র দাখিল করা উচিৎ হয় নাই। তাঁহারা ত্রিপুরী কংগ্রেস পর্য্যন্ত ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না। সুভাষচন্দ্রের যুক্তরাষ্ট্র বিরোধিতা ও সংগ্রামাত্মক কর্ম্মসূচীই বিরোধের কারণ।

কংগ্রেসের ঐক্য রক্ষাকল্পে সুভাষ যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন।

সুভাষচন্দ্র ১৫ই ফেব্রুয়ারী ওয়ার্দ্ধায় মহাত্মার সহিত তিন ঘণ্টা আলোচনা করেন এবং উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি হয় এবং গান্ধীজি তাঁহার পরামর্শ দিতে পরাঙ্মুখ হইবেন না প্রতিশ্রুত হন। তৎপর বার জন সভ্য অকস্মাৎ পদ ত্যাগ পত্র দাখিল করিলেন। সুভাষচন্দ্র একটু সুস্থ হইয়া পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করিলেন। কৃপালনী কংগ্রেস সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার পদত্যাগে সমস্ত কার্য্যই সভাপতি ও অবশিষ্ট সভ্য শরৎ বসুর উপর পড়িল।

ত্রিপুরীতে অধিবেশন—ত্রিপুরী অধিবেশনের মাত্র দশ দিন বাকী আছে। সুভাষচন্দ্র নিউমোনিয়ায় সংশয়াপন্ন পীড়িত। ৬ই মার্চ্চ চিকিৎসকগণের পরামর্শ উপেক্ষা করিয়া এম্বুলেন্স গাড়ীতে হাওড়ায় আসিয়া বোম্বাই মেলে ত্রিপুরী রওনা হন। কংগ্রেসের অধিবেশনের পূর্ব্বে নিখিল ভারত রাষ্ট্রিয় সমিতির অধিবেশনে পণ্ডিত গোবিন্দ পন্থ মহাত্মা গান্ধীর প্রতি ও ১৯২৯ সালের ওয়ার্কিং কমিটির প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করিয়া এবং গান্ধীর সহিত পরামর্শ করিয়া নূতন ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য নির্ব্বাচন করিতে অনুরোধ করিয়া একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সুভাষচন্দ্র সভাপতিরূপে আইনতঃ এই প্রস্তাব বিধি বহির্ভূত ঘোষণা করিতে পারিতেন কিন্তু নিজের ব্যাপার বলিয়া উদারতা দেখাইয়া তিনি এই প্রস্তাব উত্থাপনের অনুমতি দেন।

পন্থের প্রস্তাবে পাশ হইল, গান্ধীজীর দল জিতিলেন। সুভাষ চন্দ্রের নিউমোনিয়া অসুখ এত বাড়িয়া গেল যে ডাক্তার তাঁহাকে জব্বলপুরে হাঁসপাতালে কিংবা সেবা সদনে পাঠানর পরামর্শ দিলেন। সুভাসচন্দ্র বলিলেন, "আমি জব্বলপুরে হাঁসপাতালে যাইবার জন্য এখানে আসি নাই। কংগ্রেস শেষ হইবার পূর্ব্বে এখানে মরিব সেও ভাল তবুও অন্যত্র যাইব না।" তিনি অসুস্থতার জন্য শোভাষাত্রায় যোগ দিতে পারিলেন না। কংগ্রেস অধিবেশনেও পন্থের প্রস্তাব গৃহীত হইল। শুনা যায় পন্থের প্রস্তাবে স্বপক্ষে ভোট সংগ্রহের জন্য নরমপন্থীরা সমস্ত রাত তাঁবুতে ক্যানভ্যাস করেছিলেন। সুভাষচন্দ্র গান্ধীজির সঙ্গে মিটমাটের অনেক চেষ্টা করিলেন। গান্ধীজিকে কলিকাতায় আসিয়া ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য নির্ব্বাচিত করিতে অনুরোধ করিলেন। তাহাতেও গান্ধীজি রাজি হলেন না। তৎপর সুভাষচন্দ্র অনেক পত্রালাপ করিলেন। তাহাতেও সমস্যার সমাধান হইল না। যখন কোন ফল হইল না তখন তিনি কলিকাতায় নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন আহ্বান করেন। এখানে নরমপন্থীরা বিপুল সংখ্যায় জমা হইলেন। সুভাষচন্দ্র যখন সমস্ত আপোষ মীমাংসার কোন আশা দেখিলেন না তখন তিনি পদত্যাগ পত্র দাখিল করিলেন। তাঁহার স্থলে রাজেন্দ্র প্রসাদ সভাপতি নির্ব্বাচিত হন।

সুভাসচন্দ্র ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের পর কংগ্রেসের 'ভিক্ষাং দেহি' নীতিকে অপছন্দ করিতেন। শক্তিশালী নেতার অধীনে

কংগ্রেসকে বিপ্লবাত্মক সংগ্রামশীল প্রতিষ্ঠান করিতে চাহিতেন। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দেশের সমস্ত জনগণকে, সমস্ত দলকে ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক, হিন্দু, মুসলমানকে যাহাতে এক পতাকাতলে আনিতে পারা যায় এবং যাহাতে অবিলম্বে একটি অহিংস সংগ্রামে ঝাপাইয়া পড়া যায় এইরূপ একটি নির্দ্দিষ্ট নীতি ও কার্যক্রম দেশের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে চাহিয়াছিলেন। এমন নেতার দরকার যিনি তাঁহার ব্যক্তিত্বে দেশের মধ্যে কর্ম্মের প্রবল বন্যা বহিয়ে দিতে পারেন। দেশকে নিষ্ক্রিয়তার পথে টেনে নিতে চাননি। মহাত্মা যতদিন আইন অমান্য আন্দোলন চাইতেছিলেন ততদিন সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে কোন মতভেদ হয় নাই। ১৯৩৩ সালে এই আন্দোলন বন্ধ হইবার পর হইতে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের বিরোধ দিন দিন বাড়িতে থাকে।

সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের কর্ত্তৃপক্ষের আচরণে ও একনায়কত্বে বিরক্ত হইয়া কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া চরম-পন্থীদের লইয়া Forward Bloc নামক এক দল গঠন করেন। ইহাদের নীতি হইল সংগ্রামাত্মক, কোন আপোষ মূলক নহে। সুভাষচন্দ্রের উদ্দেশ্যে ছিল—ছাত্র, কৃষাণ, শ্রমিক, সমাজতন্ত্রী, সাম্যবাদী সব একত্র করা এবং এক নিদ্দিষ্ট নীতিতে কাজ করা। স্বাস্থ্য লাভের পর সুভাসচন্দ্র ভারতের সর্বত্র নূতন দলের নীতি ও কার্যক্রম বিষয়ে বক্তৃতা দেন এবং ভারতের সর্বত্র Forward Bloc এর শাখা স্থাপিত হয়। কলিকাতা

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি দুইটি প্রস্তাব পাশ করেন যথা :— (১) প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির অনুমতি ভিন্ন কোন প্রদেশের কেহ বা কোন প্রতিষ্ঠান সত্যাগ্রহ করিতে পারিবে না। (২) দ্বিতীয় প্রস্তাবে কংগ্রেস মন্ত্রীদের সহিত কংগ্রেস কমিটিগুলির সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। সুভাষচন্দ্র এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। তিনি মনে করেন যে এই প্রস্তাব নিয়মতান্ত্রিকতাকে প্রশ্রয় দিবে, কংগ্রেসের উপর মন্ত্রীদের প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়াইবে এবং কংগ্রেস জন সাধারণ হইতে পৃথক হইয়া পড়িবে। এই সকল কারণে তিনি সর্ব্বত্র এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা আহ্বান করেন। সুভাষচন্দ্র বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতিরূপে দুইটি প্রস্তাবের বিরুদ্ধাচরণ করেন। রাজেন্দ্রপ্রসাদ ওয়ার্দ্ধায় ওয়ার্কিং কমিটিকে আহ্বান করেন। এই অধিবেশনে কমিটি সুভাষচন্দ্রকে বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটির সভাপতি হইবার এবং তিন বৎসরের জন্য যে কোন কংগ্রেস কমিটির সভ্য হইবার অযোগ্য মনে করেন। হায়! অদৃষ্টের পরিহাস! কিন্তু বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি তাঁহাকে সভাপতি নির্ব্বাচিত করেন। ফলে ওয়ার্কিং কমিটি বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটিকে পর্য্যন্ত বাতিল করিয়া দেন।

সুভাষচন্দ্র কোন জাতীয় অপমান সহ্য করিতে পারিতেন না। ইতিহাসে নবাব সিরাজদ্দৌলার কর্ত্তৃক অন্ধকূপ হত্যার অনুষ্ঠান মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। তিনি সিরাজদ্দৌলার মিথ্যা কলঙ্কের নিদর্শন হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণের

জন্য আন্দোলন করেন। সেইজন্য বাংলা সরকার ভারত রক্ষা আইনানুসারে তাহাকে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য হাজতে রাখে কিন্তু বিপুল আন্দোলনের ফলে বাংলা সরকার মনুমেণ্ট অপসারিত করিতে বাধ্য হয়। কারাবাস অবস্থায় তিনি উপনির্ব্বাচনে ভারতীয় কেন্দ্রীয় পরিষদে সভ্য নির্ব্বাচিত হন। হাজতে তাঁহার স্বাস্থ্যের পুনরায় অবনতি ঘটে। হাজতে থাকা কালে সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে দুইটি মামলা আনা হয়। একটি কলিকাতায় মহম্মদ আলি পার্কে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য, অপরটি Forward Bloc কাগজে 'Date of Reckoning' শীর্ষক প্রবন্ধে লেখার জন্য। সুভাষচন্দ্র তাঁহাকে পর পর বিনাবিচারে অনির্দ্দিষ্ট কাল আটক রাখা অত্যন্ত অন্যায় মনে করিলেন। তিনি ইহার প্রতিবাদে আমরণ অনশন করিতে মনস্থ করিলেন। তৎপূর্ব্বে তিনি বাংলা সরকারকে একখানি আবেগপূর্ণ করুণ পত্র দেন। ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে বিনাদোষে কি অমানুষিক অন্যায় ব্যবহার তাঁহার উপর হইয়াছে! এই পত্রের অনুবাদ করিয়া কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল।

ঐতিহাসিক পত্র

"আমার কোন আশা নাই যে আমি সরকারের নিকট হইতে কোন প্রতিকার পাইব। আমার প্রথম অনুরোধ আমার এই পত্রখানি বাংলা সরকার তাহাদের সরকারি দপ্তরখানায় রক্ষা করিবেন। এই পত্রের মধ্যে দেশবাসীর প্রতি আমার শেষ

বাণী আছে এবং ইহা আমার 'রাজনৈতিক বাইবেল' স্বরূপ। বাংলা সরকার আমার সহিত স্পষ্টতঃ বে-আইনী ও অসঙ্গত ব্যবহার করিতেছেন। এই অদ্ভুত আচরণের একমাত্র কৈফিয়ত আমার মনে হয় যে বাংলা সরকার কোন অজ্ঞাত কারণে আমার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ মূলক নীতি অবলম্বন করিয়াছেন।"

"...অন্যায় করার চেয়ে অন্যায় সহ্য করা অধিক পাপ। সুতরাং আমি অন্যায়ের প্রতিবাদ করিব। সাধারণ প্রতিবাদ কাগজে বা সভাতে আন্দোলন, সরকারের নিকট আবেদন নিবেদন, পরিষদে মুক্তির দাবি, আইনের আশ্রয়—সবই নিষ্ফল হয় নাই কি? এখন বন্দীদের হাতের শেষ অস্ত্র অনশনে প্রাণ ত্যাগ। আমি জানি ইহাতে কোন ফল হইবে না। টেরেন্স ম্যাকসুইনি ও যতীন দাসের দৃষ্টান্ত আমার মানস চক্ষে ভাসিতেছে। (ইহারা দুইজনে জেলে অনশনে প্রাণত্যাগ করেন।)"

"বর্ত্তমান অবস্থায় আমার জীবন দুর্ব্বিষহ হইয়াছে। অবিচার ও অন্যায়ের সঙ্গে অনবরত আপোষ করিয়া জীবনের মূল্য ক্রয় করা আমর ধাতে সয় না। এইরূপ মূল্য দেওয়ার চেয়ে মরণ শ্রেয়ঃ।......আমি বলি "হয় আমাকে মুক্তি দাও না হয় আমি মরিব"।...যদিও আমার মৃত্যুতে এখনই কোন বাস্তব ফল হইবে না তবুও কোন ত্যাগই বৃথা যায় না। কেবল ত্যাগ ও কষ্টের মধ্যে দিয়েই কোন মহৎ উদ্দেশ্য সফল হয়। সর্ব দেশে সর্বকালে শহীদের রক্ত হইতেই নূতন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে।"

"এই মরজগতে সকলই ধ্বংস প্রাপ্ত হয় ও হইবে কেবল ভাব আদর্শ, স্বপ্ন ধ্বংস হইবে না। একজন মানুষ একটা আদর্শের জন্য মরিতে পারে কিন্তু তাহার মৃত্যুর পর সেই আদর্শ সহস্র জীবনে মূর্ত্ত হইয়া উঠে।...এই উপায়ে এক যুগের আদর্শ ও স্বপ্ন অন্য যুগকে প্রভাবান্বিত করে। পৃথিবীতে কোন আদর্শই কষ্ট ও ত্যাগের অগ্নিপরীক্ষা ছাড়া সফল হয় নাই।"

"একটি আদর্শের জন্য জীবন ধারণ করেছি এবং মৃত্যু বরণ করেছি—এই নিশ্চিত চিন্তার চেয়ে মানুষের পক্ষে আর বেশী কি সান্ত্বনা থাকিতে পারে? তাঁর অসম্পূর্ণ কাজ সম্পন্ন করিতে শত শত লোক সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইবে—এই জ্ঞান অপেক্ষা আর কি আত্মতৃপ্তি হইতে পারে? তাঁর বাণী তাঁর আদর্শ দেশের প্রত্যেক স্থানে পর্ব্বতে উপত্যকায় সমভূমিতে এমন কি সমুদ্র পারে দূরাঞ্চলেও নীত হইবে—এই নিশ্চয়তার চেয়ে কি পুরস্কার আত্মা কামনা করে? কোন আদর্শের বেদীমূলে জীবন বিসর্জ্জন অপেক্ষা মানব জীবনের আর কি কাম্য আছে? মানুষ যদি ত্যাগ ও কষ্টের দ্বারা পার্থিব জীবনে কিছু ক্ষতিগ্রস্থ হয় তবে সে প্রতিদানে অমর জীবনের উত্তরাধীকারী হইয়া লাভবান হইবে। ইহাই আত্মার নীতি। জাতিকে বাঁচাইতে হইলে মৃত্যু চাই। ভারত স্বাধীন হইয়া গৌরবের সহিত যাহাতে বাঁচে সেজন্য আমাকে আজ মরিতে হইবে।

"দেশবাসীকে আমি বলি—ভুলিও না মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড় অভিশাপ পরাধীন হয়ে থাকা। ভুলিও না অন্যায় ও

অবিচারের সঙ্গে আপোষ করা মহাপাপ। সনাতন নিয়ম মনে রাখিও যে যদি কোন জিনিষ পেতে চাও তবে স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে। মনে রাখিও যে কোন মূল্য দিয়ে অবিচারের সহিত যুদ্ধ করাই পরম ধর্ম্ম।

"গভর্ণমেন্টকে আমি বলি—"অবিচারের ও সাম্প্রদায়িক বিভেদ স্থষ্টির পথ পরিত্যাগ করুন। এখনও ফিরিবার সময় আছে।"

"আমার শেষ অনুরোধ—'আপনারা আমাকে শান্তিভাবে মরিতে দিবেন। জোড়পূর্ব্বক কোন বাধা দিবেন না। যতীন দাস, টেরেন্স ম্যাকস্থইনি ও মহাত্মা গান্ধীর অনশন ধর্ম্মঘটের সময় যে রকম কোন বাধা দেন নাই, আমার বিষয়ে সেইরূপ কোন বাধা পাইব না। যদি জোড়পূর্ব্বক আমাকে খাওয়ানর চেষ্টা হয় তবে আমি সমস্ত শক্তি দিয়া তাহা রোধ করিব। আমি ১৯৪০ সালের ২০শে নভেম্বর হইতে অনশন আরম্ভ করিব"।

পত্রে এই সাবধান বাণী দেওয়ার পর যখন সুভাষচন্দ্র সত্যই অনশন ব্রত আরম্ভ করেন গভর্ণমেণ্ট তাহাকে মুক্তি দেন। এবং তাঁহার আরোগ্যলাভ পর্য্যন্ত তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত মামলা মুলতুবি থাকে।

জীবনে আধ্যাত্মিক পরিবর্ত্তন ও অকস্মাৎ অন্তর্ধান

—মুক্তিলাভের পর সুভাষচন্দ্রের জীবনে এক অভাবনীয় পরিবর্ত্তন আসে। গভর্ণমেণ্টের নির্দ্দয় অত্যাচারে বিনাবিচারে বিনাদোষে ক্রমাগত কারাবাসে এবং কংগ্রেস নেতাদের অশোভ-

নীয় ব্যবহারে কর্ম্মজীবনের প্রতি তিনি বীতশ্রদ্ধ হন। এই সময় তিনি বহির্জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাড়ীর দোতলায় নিজের ঘরে নিঃসঙ্গ অবস্থায় থাকিতেন। এই সময় তিনি সম্পূর্ণ মৌন ব্রত অবলম্বন করেন, কাহারও সঙ্গে এমন কি বাড়ীর কোন লোকের সঙ্গেও দেখা সাক্ষাৎ করিতেন না। তিনি তপস্বীর ন্যায় পূজা ও গভীর ধ্যানে সময় অতিবাহিত করিতেন। যিনি দিবারাত্রি বাহিরের কর্ম্মের মধ্যে ডুবিয়া থাকিতেন হঠাৎ তিনি সকল কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া আত্মচিন্তায় মগ্ন হইলেন—ইহাতে সকলেই বিস্মিত হইলেন। তিনি অন্তর্ধানের পূর্ব্বে কয়েক দিবস মাত্র ফলের রস ও দুধ পান করিতেন। হঠাৎ ১৯৪১ সালের ২৬শে জানুয়ারী (ভারতের স্বাধীনতা দিবস) সংবাদ পাওয়া গেল সুভাষচন্দ্র অসুস্থ অবস্থায় তাঁহার বাড়ী হইতে রহস্যজনকভাবে অন্তর্ধান করিয়াছেন। যে দিন অন্তর্ধান করেন সেই দিন তাঁহার ঘরে ব্যাঘ্রচর্ম্মের উপর একখানি গীতা ও ৺কালীর ছবি পাওয় যায়। প্রায় একবৎসর তাঁহার অন্তর্ধানের কোন কূল কুনারা হইল না—কোথায় গেলেন বা কি উপায়ে গেলেন। কেহ ভাবিলেন যে রাজনীতিতে বীতশ্রদ্ধ হইয়া সন্ন্যাস-ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন; কেহ ভাবিলেন তিনি বিদেশে আশ্রয় লইয়াছেন। সর্বপ্রথমেই ভারতে Council of State এ এবং বিলাতে House of Commonsএ গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে বলা হয় যে সুভাষচন্দ্র খুব সম্ভব বার্লিনে কিংবা রোমে আছেন। · এই সংবাদের সূত্র ছিল রোম, বার্লিন ও টোকিও রেডিও হইতে

প্রাপ্ত সংবাদ। এইরূপ আনুমানিক সংবাদের উপর নানারূপ জল্পনাকল্পনা ও গবেষণা চলিতে থাকে। হঠাৎ ১৯৪২ সালে ২৮শে মার্চ্চ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সংবাদদাতা রয়টার সংবাদ দিলেন— "টোকিও রেডিওতে বলেছে যে সুভাষচন্দ্র স্বাধীন ভারত কংগ্রেসে যোগ দিবার জন্য টোকিও যাইবার পথে জাপানের উপকূলে বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হইয়াছেন"। পরদিনই রয়টার জানান যে এই সংবাদ ভুল। সুভাষচন্দ্র বেঁচে আছেন। যাহা হউক এক্ষণে জানা গিয়াছে যে সুভাষচন্দ্র ভারত হইতে আফগানিস্থানের পথে বা অন্য কোন উপায়ে বার্লিন যান। সেখানে হিটলার তাঁহাকে India's Fuehrer and Excellence উপাধি দেন। সুভাষচন্দ্র অক্ষশক্তির সঙ্গে ভারতকে স্বাধীন করবার জন্য একটি চুক্তি করেন। তৎপর তিনি ডুবোজাহাজে জাপানে যান। আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করিয়া ব্রিটিশের সঙ্গে লড়াই করেন। তৎপর জাপান পরাজিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে আজাদ হিন্দ ফৌজও আত্মসমর্পণ করে। এইরূপ সংবাদ পাওয়া যায় যে সুভাষচন্দ্র সিঙ্গাপুর হইতে বিমানে টোকিও যাইবার পথে বিমান দুর্ঘটনায় সাংঘাতিকভাবে আহত হইয়া হাঁসপাতালে মারা যান। কিন্তু এই সম্বন্ধে পরস্পর বিপরীত সংবাদ আসিতেছে। তিনি মৃত কি জীবিত সঠিক কিছু জানা যায় নাই।

চারিদিকে গোয়েন্দা ও পুলিশ পরিবেষ্টিত অবস্থায় কি উপায়ে সুভাষচন্দ্র সকলের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া ব্রিটীশ

সিংহের কবল হইতে পলাইতে পারিয়াছিলেন তাহা এখনও রহস্যাবৃত আছে। মহারাষ্ট্রের "পার্ব্বত্য মুষিক" দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ সম্রাট আলমগীরের কয়েদ খানা হইতে সকলের চক্ষে ধূলি দিয়া ফলের ঝুড়ির মধ্যে পলাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি!

সুভাষচন্দ্রের জীবনের প্রধান ঘটনাবলী।

জন্ম—১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ ২৩শে জানুয়ারী
ইউরোপীয়ান স্কুলে পাঠ—১৯০২ খৃঃ হইতে ১৯০৯ খৃঃ পর্যন্ত
র‍্যাভেন্‌শা স্কুলে „ —১৯০৯ খৃঃ হইতে ১৯১৩ খৃঃ পর্যন্ত
আই, এ ক্লাশে „ —১৯১৩ খৃঃ হইতে ১৯১৫ খৃঃ পর্য্যন্ত
ছয় মাসের জন্য গৃহত্যাগ—১৯১৪ খৃঃ
বি, এ ক্লাসে পাঠ—১৯১৫ খৃঃ, ১৯১৭ খৃঃ—১৯১৯ খৃঃ
ওটেনের ব্যাপারে বহিষ্কার—দুই বৎসর
বিলাত যাত্রা (পাঠের জন্য)—১৯১৯ খৃঃ ডিসেম্বরে
আই, সি, এস পাশ—১৯২০ খৃঃ আগষ্ট
আই, সি, এস ত্যাগ—১৯২১ খৃঃ মে
কেম্ব্রিজ Tripos—১৯২১ খৃঃ মে
জাতীয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ—১৯২১ খৃঃ
ভারতে যুবরাজ বয়কট—১৯২১ খৃঃ ১৭ই নভেম্বর
প্রথম কারাদণ্ড (ছয়মাস)—১৯২২ খৃঃ মার্চ্চ
উত্তরবঙ্গ প্লাবনের কার্য্য—১৯২২ খৃঃ

বঃ প্রাঃ কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক—১৯২৩ খৃঃ

করপোরেশনের প্রঃ কর্ম্মকর্ত্তা—১৯২৪ খৃঃ

মান্দালয় জেলে—১৯২৫ খৃঃ জানুয়ারী—১৯২৭ খৃঃ মে

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্পাদক ১৯২৭-১৯২৯ খৃঃ

নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ১৯২৯ খৃঃ-১৯৩১ খৃঃ

সভাপতি

নয় মাস কারাদণ্ড ১৯৩০ খৃঃ জানুয়ারী

করপোরেশনের মেয়র ১৯৩০ খৃঃ আগষ্ট

সাতদিনের কারাদণ্ড ১৯৩১ খৃঃ জানুয়ারী

ছয়মাসের কারাদণ্ড ১৯৩২ খৃঃ

অলডারম্যানের পদত্যাগ ১৯৩১ খৃঃ

তিন আইনে কারাবাস ৯৩২ খৃঃ জাঃ-১৯৩৩ খৃঃ ফেঃ

ইউরোপে অবস্থান ১৯৩৩ খৃঃ মার্চ্চ—১৯৩৬ খৃঃ

তিন আইনে কারাবাস ১৯৩৮ খৃঃ

হিরাপুর কংগ্রেসের সভাপতি ১.৩১ খৃ

ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতি ১৯৩৯ খৃঃ

সভাপতির পদ ত্যাগ ”

কংগ্রেস হইতে বহিষ্কার ১৯৩৯ খৃঃ আগষ্ট

ভারত রক্ষা আইনে গ্রেপ্তার ”

মুক্তি ১৯৪০ খৃঃ

অন্তর্ধান ১৯৪১ খৃঃ জানুয়ারী

সুভাষচন্দ্র লাহোর, পাবনা, হুগলী, বেরার, যশোহর প্রভৃতি

বহু স্থানের যুব সম্মেলনের ও নবযোয়ান সম্মেলনের এবং মহারাষ্ট্র প্রাদেশিক রাষ্ট্রিয় সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন।

সুভাষচন্দ্রের জীবন অসীম কষ্ট ও উগ্র ত্যাগের মধ্য দিয়া একটি আদর্শকে সফল করিবার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত জীবন। সেই আদর্শ ছিল ভারতের স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতার বেদীমূলে সমস্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য জীবনের সকল আশা-ভরসা সকল চিন্তা ভাবনা সকল কর্ম্ম এমন কি নিজের যৌবনকে পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। বিবাহ করিলে পাছে পরিবারবর্গের চিন্তার জন্য দেশ-সেবায় একনিষ্ঠতার অভাব ঘটে সেইজন্য তিনি চিরকুমার থাকেন। তিনি সংসারে থাকিয়া তপস্বীর মত জীবন নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁর মনোবল ছিল অসীম। সকল নেতার জীবনে দেখা যায় কখন না কখন কিছু পরিবর্ত্তন ঘটে। সুভাষচন্দ্রের মত আজীবন একনিষ্ঠ দেশসেবক খুব কমই দেখা যায়। তাঁর ভগবানে যেমন অসীম ভক্তি ছিল তেমনি তিনি আত্ম-শক্তিতে খুব বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর এই সকল শক্তির উৎস ছিল আধ্যাত্মিক জীবন ও নিষ্কলঙ্ক চরিত্র। কূট রাজনীতি জ্ঞান, সংগ্রামাত্মক মনোভাব সকলই তাহার ছিল অসাধারণ রকমের।

নেতাজীর অমরকীর্ত্তি

আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্ট ও আজাদ হিন্দ ফৌজ।

জাপানীদের তাঁবেদার গভর্ণমেণ্টের চেষ্টা—১৯৪২ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী সিঙ্গাপুরের পতনের পর ব্রিটিশ বাহিনী দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় (সিঙ্গাপুর, মালয়) জাপানের কাছে পরাজিত হইয়া পলাইয়া আসে। প্রায় ৩০ লক্ষ হতভাগ্য সামরিক ও বেসামরিক ভারতবাসিকে তাঁদের ভাগ্যের উপর পশ্চাতে ফেলিয়া আসে। এই সকল ভারতীয়গণকে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে কাজে লাগাইবার জন্য জাপানী মেজর ফুজিয়ারা কতকগুলি নেতৃস্থানীয় ভারতবাসীকে আমন্ত্রণ করেন। তাঁর গোপন উদ্দেশ্য ছিল যে ভারতীয়গণ দ্বারা একটি তাঁবেদার স্বাধীনতা সঙ্ঘ গঠন করা ও ভারত আক্রমণ করা। ভারতীয় নেতাগণ জাপানের তাঁবেদার হিসাবে কোন সমিতি গঠন করিতে অস্বীকার করেন। তাঁহারা কোন বৈদেশিক শক্তির ভারত আক্রমণের অধিকার স্বীকার করেন না। নূতন সাম্রাজ্যবাদের এই আবেদনে ভারতীয় নেতাগণ সাড়া দেন নাই। মুক্তিদাতা বাহিনী হিসাবে ভারতে প্রবেশের অধিকার একমাত্র ভারতীয় স্বাধীন বাহিনীরই আছে।

ভারতীয়ের সভা—রাসবিহারি বসুর নেতৃত্বে ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে ১০ই মার্চ্চ সিঙ্গাপুরে ও ৩০শে মার্চ্চ টোকিওতে প্রবাসী সমস্ত ভারতীয় প্রতিনিধিদের দুইটি সভা হয়। শেষোক্ত সভায় প্রস্তাব হয় যে :—(১) ভারতের পূর্ণস্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য

প্রবাসী ভারতীয়দের দ্বারা **আজাদ হিন্দ সঙ্ঘ** (Indian Independence League) নামক প্রতিষ্ঠান গঠন করা হউক। ইহার অধীনে **আজাদ হিন্দ ফৌজ** থাকিবে। (আজাদ= স্বাধীন)। আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের **কর্ম্ম পরিষদ** জাপানের নিকট সামরিক রসদ চাহিতে পারিবেন। (২) স্বাধীন ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র রচনা করিবে ভারতীয় কংগ্রেস।

১৯৪২ সালের মাঝামাঝি ব্যংককে ভারতীয়দের বিরাট সভা হয়। ইহাতে স্থির হয় যে (১) আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের আদর্শ ও কার্যপ্রণালী ভারতীয় কংগ্রেসের অনুরূপ হইবে এবং কংগ্রেসের সঙ্গে সঙ্ঘের যোগ থাকিবে। (২) প্রবাসী বেসামরিক ও সামরিক ভারতীয়দের মধ্য হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করিতে হইবে। (৩) সঙ্ঘের প্রতি জাপানীদের সুস্পষ্ট নীতি ঘোষণার দাবি জানাইতে হইবে।

আজাদ হিন্দ সঙ্ঘ ও ফৌজ—অতঃপর গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে আজাদ হিন্দ সঙ্ঘ গঠিত হয়। রাসবিহারী বসু সভাপতি হন। সিঙ্গাপুরে প্রধান কেন্দ্র ও অন্যান্য জায়গায় শাখা স্থাপিত হয়। এই সময়ে ভারতের ভিতরে গান্ধীজির নির্দ্দেশে **'ভারত ত্যাগ কর'** আন্দোলন আরম্ভ হয়। ইহাই বিখ্যাত আগস্ট আন্দোলন। এই আন্দোলনের ফলে মেদিনীপুরে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যাপকভাবে হিংস ও অহিংস কার্যকলাপ চলিতে থাকে। (বিবরণ পরে দ্রষ্টব্য) .

এই চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতিতে ক্যাপ্টেন মোহন সিংহের অধি-

নায়কত্বে সর্ব প্রথমে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠিত হয়। ইহাতে জাপানের নিকটে আত্মসমর্পণকারী অনেক ভারতীয় সৈন্য যোগ দেয়।

জাপানের সহিত বিবাদ—ইহার পর আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের এক নূতন বিপদ দেখা দিল। জাপানীরা আজাদ হিন্দ ফৌজের কার্য্যকলাপে হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। জাপানীরা তাহাদের নীতিও স্পষ্টভাবে ঘোষণা করিল না।

আজাদ হিন্দ সঙ্ঘও জাপানের কোন আদেশ মানিতে রাজি হইল না। ফলে উভয় দলে বাধিল সংঘর্ষ। জাপানীরা ১৯৪২ সালের ৮ই ডিসেম্বরে মোহন সিংকে গ্রেপ্তার করিল। ইহাতে অনেক আজাদি সৈন্য ব্যাজ ফিরাইয়া দিলেন এবং সঙ্ঘের অনেক সভ্য পদত্যাগ করিলেন। ১৯৪৩ সালের জানুয়ারীতে পুনরায় সৈন্য সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু জাপানীরা একটি প্রতিদ্বন্দী তাঁবেদার ভারতীয় দল গঠন করেন এবং নানারূপ মিথ্যা রটনা সুরু করেন। জাপানীদের ষড়যন্ত্রে নানারূপ বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। প্রথম আজাদি বাহিনী ভাঙ্গিয়া যায়। রাসবিহারি বসুর বিরুদ্ধে নানারূপ সমালোচনা হইতে থাকে এবং তাঁহার নেতৃত্বে সকলে আস্থাহীন হন। এইরূপ অবস্থায় সিঙ্গাপুরে একটি সম্মেলনে রাস বিহারি সুভাষচন্দ্রের আগমন বার্ত্তা ঘোষণা করেন।

সুভাষচন্দ্রের আগমন ও নীতি ঘোষণা—১৯৪৩ সালে তিনি সিঙ্গাপুরে পৌছান। ৪ঠা জুলাই তিনি আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। রাসবিহারী পরামর্শদাতা

থাকেন। ৫ই জুলাই আজাদি বাহিনীর কথা রেডিওতে জগতে ঘোষণা করা হয়। সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে সর্বত্র নবজীবনের সঞ্চার হয়। শ্রীমতী লক্ষ্মীর নেতৃত্বে **রাণী অফ ঝান্সি** নামক একটি নারী স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনী গঠিত হয়। সুভাষচন্দ্র স্পষ্ট ঘোষণা করেন :—(১) আজাদি বাহিনী ভারতবর্ষের প্রতিনিধি • মূলক জাতীয় বাহিনী। (২) জাপানীদের সহিত ইহার কোন সংস্রব নাই। আজাদি বাহিনী বিভিষণ বাহিনী (Quisling) নহে। (২) ভারতভূমিতে কোনরূপ বৈদেশিক কর্তৃত্ব বা আক্রমণ স্বীকার করা হইবে না। (৩) জাপানীরা ভারতভূমিতে পদার্পণ করিলে তাহাদের তাড়াইতে হইবে।

অস্থায়ী স্বাধীন ভারত গভর্ণমেণ্ট—পরে সঙ্ঘের সামরিক ও বেসামরিক কার্যকলাপ বাড়িতে লাগিল। সেইজন্য সুভাষচন্দ্র **অস্থায়ী স্বাধীন ভারত গভর্ণমেণ্ট** গঠন করেন। তিনিই এই রাষ্ট্রের অধিনায়ক বা **নেতাজী** নির্ব্বাচিত হন। ১৯৪৩ সালে ২৩শে অক্টোবর এই গভর্ণমেণ্ট ইংলণ্ড ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। জাপান, জার্মান প্রভৃতি নয়টি রাষ্ট্র ইহাকে স্বীকার করে। সঙ্ঘের ও গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মস্থল রেঙ্গুনে স্থানান্তরিত হয়। আজাদি ফৌজ যে সকল অঞ্চল দখল করিত এই রাষ্ট্র তাহাই শাসন করিত। প্রথমে নেতাজি ভারতের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন। তৎপরে মন্ত্রীগণ নেতাজি ও ভারতের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন। গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে শাসন চলিত। কাহারও

খামখেয়ালি কার্য চলিত না। ভারতীয় ভাষায় অনেক খবরের কাগজ প্রকাশিত হইত। আজাদ সঙ্ঘের রেডিও ষ্টেশন ছিল। ফৌজদারি ও দেওয়ানী আদালতে বিধিবদ্ধ আইন অনুযায়ী বিচার হইত। গভর্ণমেণ্টের ১৯টি বিভিন্ন বিভাগ ছিল। প্রত্যেক বিভাগেই মন্ত্রী ছিল। রেকর্ড বুক্স, নথিপত্র রাখা হইত। ভারতীয়গণ এই রাষ্ট্রের নাগরিক ছিল। মালয়ে, যাভায়, ফিলিপাইনে, চীনে, জাপানে, সুমাত্রায় প্রভৃতি সব জায়গায় বহু শাখা ছিল; মালয়ে ৭০টি, বার্মায় ১০০টি, শ্যামে ২৪টি শাখা ছিল। সৈন্য ও বেসামরিক অফিসার সংগ্রহ করা হইত। হিন্দুস্থানীতে সব রাজ-কার্য্য চলিত। সামরিক শিক্ষাদানের নয়টি কেন্দ্র ছিল। এক মালয়ে ২০ হাজার সৈন্যকে সামরিক শিক্ষা দেওয়া হয়; একই সময়ে ৭০০০ লোককে সামরিক শিক্ষা দেওয়া হইত। নারী-দিগকেও সামরিক শিক্ষা দেওয়া হইত। আর ভারতীয়গণই রাষ্ট্রের ও ফৌজের অর্থ যোগাইত। বার্মায় ১৫ কোটি টাকা সংগৃহীত হয়। মালয়ে ১৯৪৪সালের 'নব বৎসর' উৎসবে ৪০ লক্ষ টাকা উঠে। মালয়ে মোট ৫কোটি উঠে; সুভাষচন্দ্রের গলার মালা ১লক্ষ হইতে ১২লক্ষ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইত। একবার একজন ধনী পাঞ্জাবী তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি দিয়া মালা ক্রয় করেন। এই সমস্ত অর্থ National Bank এ জমা হইত। ব্যাঙ্কে ৪০ কোটির উপর টাকা ছিল। রেঙ্গুণে নেতাজী তহবিল নামে একটা তহবিল ছিল। ফৌজ এই সকল টাকা হইতে যুদ্ধের সরঞ্জাম ক্রয় করিত।

সমাজ সেবা—গভর্ণমেণ্ট সমাজ সেবায় অর্থব্যয় করিত। যুদ্ধ পীড়িত ও মজুরদিগের সাহায্যার্থে চিকিৎসালয়, ডাক্তার, ঔষধপথ্য প্রভৃতির জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করিত। কুয়ালালামপুরে বৃহৎ সাহায্য কেন্দ্র ছিল। ইহার মাসিক খরচ ৭৫ হাজার টাকা ছিল। বর্মা ও শ্যামেতেও অনেক চিকিৎসালয় ছিল। সঙ্ঘ মালয়ে জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া প্রায় ২০০০ একর জমি বাসের উপযুক্ত করিয়াছিল। শিক্ষার জন্য সঙ্ঘ অনেক জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া ছিল; এক বার্মাতেই ৬৫টি জাতীয় বিদ্যালয় ছিল।

ভারত আক্রমণ ও সেনা সংস্থান

সুভাষচন্দ্রের দৃঢ় নীতির ফলেই জাপানীরা ভারত আক্রমণের নীতি পরিত্যাগ করে। বিরাট ভারত-অভিযানের মত ক্ষমতাও জাপানীদের ছিল না। আজাদি সৈন্য ভারতে প্রবেশ করিতে মনস্থ করে। ১৯৪৪ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী আক্রমণাত্মক কার্য্য সুরু হয়। আজাদি সৈন্য ১৮ই মার্চ্চ ভারতভূমিতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে। আজাদি বাহিনীতে ছিল; (১) শানওয়াজের নেতৃত্বে ৩২০০ সৈন্য লইয়া গঠিত **সুভাষ ব্রিগেড**; (২) কিয়ানির নেতৃত্বে ২৮০০ সৈন্য লইয়া **গান্ধী ব্রিগেড**; (৩) মোহন সিংহের নেতৃত্বে ২৮০০ সৈন্য লইয়া **আজাদ ব্রিগেড**; (৪) গুরু বক্স সিংহের নেতৃত্বে ৩০০০ সৈন্য লইয়া **নেহরু ব্রিগেড**; (৫) **রাণী ঝান্সি ব্রিগেড**, (৬) **বালসেনা** (বালক বালিকা বিভাগ)—ইহারা আত্মঘাতী সেনা হিসাবে কাজ

করিত। ইহারা মিত্রপক্ষের ট্যাঙ্কের নীচে পিঠে মাইন বাধিয়া পড়িয়া থাকিত। সুযোগমত টাঙ্ক উড়াইয়া দিত এবং নিজেরা মৃত্যুবরণ করিত। (৭) তিন শত বাহাদুর দলের ফৌজ। (৮) সাত শত সাহায্যকারী সৈন্য। ইহা ছাড়া ভারী কামানবাহিনী, সংবাদ সংগ্রাহক দল, চিকিৎসক বাহিনী, ইঞ্জিনিয়ার বাহিনী, হিন্দুস্থান ফিল্ড গ্রুপ দল ছিল। সৈন্যদের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থার জন্য **ব্যবস্থা কমিটী** গঠিত হয়। ইহারা প্রচার কার্য্যও চালাইত। সৈন্যগণ ব্রিটিশ ইউনিফরম পরিত। নেতাজী জাপানে ৪৫ জন বালককে সামরিক শিক্ষার জন্য পাঠান। তাহারা সম্প্রতি ভারতে ফিরিয়াছে।

গান্ধী ব্রিগেড পালেল টামু এলাকায়, বসু ব্রিগেড কালাদান উপত্যকায়, ক্যাপ্টেন আজমীর সিংহের চারিটি দল কোহিমা রণাঙ্গনে যুদ্ধ করিয়াছিল। গান্ধী ব্রিগেডের ৬টি কোম্পানী ও এস্ এস্ বাহিনীর সৈন্যগণ অগ্রগামী ছিল। তিনটি কোম্পানী রসদ সরবরাহের কার্যে নিযুক্ত ছিল। একটি কোম্পানি যোগদানের ঘাঁটি পাহারা দিত। কোহিমা অঞ্চলে কিকারী এজেন্সীর লোকজন গুপ্তচর হিসাবে সংবাদ সংগ্রহ করিত। ভারতীয় নাগা, বর্মী ও জাপানী অসামরিক লোক দিয়া এস, এস, বাহিনী গঠিত হইয়াছিল। সরবরাহের অসুবিধার জন্য আটার পরিবর্তে সৈন্যরা জৈ খাইত। সৈন্যদিগের ধ্বনি ছিল 'জয় হিন্দ্'। সৈন্যগণ ত্রিবর্ণ রঞ্জিত কংগ্রেস ব্যাজ এবং আজাদ হিন্দ নামাঙ্কিত পিতলের ব্যাজ পরিত। শেষোক্ত ব্যাজে 'ভারতের

মানচিত্র এবং 'ইত্তিকাক, ইতমদ, কোরবাণী' (সহযোগিতা, ন্যায়-বিচার ও আত্মত্যাগ) এই তিনটি শব্দ খোদিত থাকিত। মরণ যজ্ঞে চরম আত্মাহুতির জন্য সৈন্যগণের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা দেখা দেয়, হয় তাঁহারা দিল্লী পৌঁছিবে না হয় শেষ শয্যা গ্রহণের পূর্ব্বে দিল্লীর পথ চুম্বন করিবে। ১৯৪৪ সালের মার্চ্চের মাঝামাঝি নেতাজীর চিত্র মস্তকে ধারণ করিয়া সমর সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে সৈন্যগণ বীরদর্পে ভারতভূমিতে প্রবেশ করে। ব্রিটিশের সৈন্য সংখ্যা অনেক বেশী ও খুব সুসজ্জিত থাকা সত্বেও আজাদি সৈন্যের নিকট প্রত্যেক যুদ্ধেই হারিতে লাগিল। মোরাই কোহিমা প্রভৃতি অনেক জনপদ দখল করিয়া আজাদি সৈন্য ইম্ফল অবরোধ করে। এই যুদ্ধে কোন বিমান সাহায্য ছিল না। ১৯৪৪ সালের আগষ্ট মাসে পাহাড়ী বর্ষার জন্য রসদ সরবরাহের অসুবিধা, সৈন্যদের মধ্যে ম্যালেরিয়া ও আমাশয় রোগের প্রকোপ ও ব্রিটিশ সৈন্যের নির্ব্বিচারে বোমা বর্ষণের জন্য যুদ্ধের অবস্থা সঙ্গীন হয়। প্রথমে ২৮জন আত্মসমর্পণ করে। কালাদান উপত্যকায় মেজর রাঠোরা বীর বিক্রমে মাত্র তিন কোম্পানী লইয়া বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধ করে। ব্রিটিশের হস্তে মিক্তিলার পতন হইল। ১৯৪৫ সালে ২৩শে এপ্রেল জাপানী সৈন্য রেঙ্গুন ত্যাগ করে এবং ২৪শে এপ্রেল স্বাধীন ভারত গভর্ণমেণ্ট রেঙ্গুন ত্যাগ করে। ভারতীয়দের রক্ষা করিবার জন্য জেনারেল লোক-নাথন ছয় হাজার সৈন্য লইয়া রেঙ্গুনে থাকেন এবং জে,.এন, ভাদুরী বর্মায় সঙ্ঘের সকল দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৪২

সালে যখন ব্রিটিশরা বর্মা ত্যাগ করে তখন তথায় ভীষণ রাহাজানি, অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা ঘটে কিন্তু ১৯৪৫ সালে যখন আজাদি সৈন্য ও জাপানী সৈন্য বর্মা ত্যাগ করে তখন তথায় একটিও রাহাজানি হয় নাই।

১০মে ব্রিটীশ কর্ত্তৃপক্ষ National Bank অধিকার করে। ২৮শে মে ভাদুড়ীর গ্রেপ্তারের পর সঙ্ঘের কার্যকলাপ বন্ধ হয়। সঙ্ঘের কর্ম্মিগণ, আজাদ সৈন্য দলে দলে গ্রেপ্তার হয়। কতক সৈন্য ভারতের বিভিন্ন জেলে আটক আছেন, কতক কতক সৈন্য বর্মা ও মালয়ে আটক আছেন। ১০ জনের ফাঁসি হইয়া গিয়াছে। সর্দ্দার সিং 'জয় হিন্দ, ইনক্লাব জিন্দাবাদ' বলিতে বলিতে ফাঁসি কাষ্ঠে আরোহণ করেন। ২০ বৎসর বয়স্ক যুবক রাম তেওয়ারীর ফাঁসি হইয়াছে। মহামান্য বড়লাট দয়া প্রদর্শন করিয়া কয়েক জনের ফাঁসি মকুব করিয়াছেন। অনেক সৈন্যকে মুক্তিও দেওয়া হইয়াছে। কয়েক জনের বিচার চলিতেছে।

বীরত্বের কাহিনী—আজাদি সৈন্যগণের অভূতপূর্ব্ব বীরত্ব ও সাহস, চরম সহনশীলতা, আদর্শ শৃঙ্খলতা, অপূর্ব্ব সংগঠন শক্তি, উদ্দেশ্যের প্রতি একনিষ্ঠতা, দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার উত্যগ্র আকাঙ্খার কাহিনী জগতের বীরগণের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। বীরত্বের দু'একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত নিম্নে দেওয়া হল।

(১) ইম্ফল রণাঙ্গনে ব্রিটিশ সৈন্যের সংখ্যা খুব বেশী ছিল, তাহারা কামান, বিমান, ও অন্যান্য সাজসরঞ্জামে সজ্জিত ছিল।

আজাদি সৈন্যের বিমান ছিল না। সাজসরঞ্জামও কম ছিল। তা সত্ত্বেও তাহারা ব্রিটিশদের প্রত্যেক যুদ্ধে হারিয়ে দিয়েছিল। তাহাদের সামরিক শিক্ষা, শৃঙ্খলা, ভারতের মুক্তির জন্য অনমনীয় প্রতিজ্ঞা তাহাদের অভাবনীয় সাফল্যের কারণ।

(২) ১৪২৩ ফুট উচ্চ একটি পাহাড়ের আড়ালে ব্রিটিশ সৈন্য কামানশ্রেণী সাজাইয়াছে। পাহাড়ের কিছুদূরে একটি গুরুত্ব পূর্ণ স্থানে জ্ঞান সিংহের অধীনে মাত্র ৯৮ জন সৈন্য ব্রিটিশ সৈন্যের অগ্রগতিতে যে কোন মূল্য দিয়া বাধা দিবার জন্য পরিখার মধ্যে অবস্থান করিতেছিল। ইহাদের সঙ্গে কোন মেসিনগান ছিল না। কেবল অতি পুরাতন রাইফেলই একমাত্র অস্ত্র ছিল। দুইদিন শত্রুর কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। ১৬ মার্চ্চ ভোর হইতে বেলা ১১টা পর্য্যন্ত শত্রু বিমান ক্রমাগত বোমা নিক্ষেপ করিল। তৎপর পাহাড় হইতে কামানদাগা সুরু হল এবং সঙ্গে সঙ্গে ১৩টি ট্যাঙ্ক, ১১টি কামান সজ্জিত গাড়ী, ১০টি ট্রাকের একটি যান্ত্রিক বাহিনী কামানের গোলার আড়ালে অগ্রসর হইতে লাগিল। অগ্রসরমান কামানের গাড়ী হইতে অনবরত গোলা নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। ইহাতেও আজাদি সৈন্য আত্মসমর্পণ করিল না দেখিয়া তাহারা ভারী ট্যাঙ্ক ও কামানের গাড়ী পরিখার নিকটে চালাইয়া দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে কামানগুলি চারিদিক হইতে ভীষণ ভাবে অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিল। জ্ঞানসিংহ দেখিলেন পরিখার মধ্যে মৃত্যু কিংবা বন্দী হওয়া নিশ্চিত। মরিতে যখন হবে তখন শত্রুকে না মেরে

মরা হবে না এই ভাবিয়া তিনি হুকুম দিলেন "আক্রমণ কর"।

তখন পরিখার মধ্য হইতে ৯৮জন সৈন্য এক মাত্র সম্বল "নেতাজি কি জয়' 'দিল্লী চলো' ধ্বনি করিতে করিতে পরিখা হইতে উঠিয়া ভারতের নাম লইয়া শত্রুকে আক্রমণ করিল। দুই ঘণ্টা হাতাহাতি যুদ্ধে ৪০জন আজাদি ও তদপেক্ষা বেশী শত্রু সৈন্য নিহত হইল। আজাদি সৈন্যের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া শত্রু পশ্চাৎ হটিল। জ্ঞান সিংহ হঠাৎ একটি গুলির আঘাতে নিহত হন।

নারীবাহিনী

যুগ যুগ ধরে ভারতের নারী স্নেহে, মাধুর্য্যে প্রীতিতে ঘরে ঘরে শান্তির অর্ঘ রচনা করেছে কিন্তু তাদের চিরন্তন কল্যাণী-রূপের পিছনে যে শক্তির উৎস লুকিয়ে ছিল কে তার খোঁজ রাখত! বিদেশী শাসনের নিপীড়নে, সে ভয়ঙ্কর শক্তি আজ ধীরে ধীরে প্রকাশ পাচ্ছে। আজ তারা দেখাচ্ছে ভারতের নারী শুধুই স্নেহ-মমতার উৎস নয়—তারা শক্তিরও উৎস। গৃহকোণই শুধু তাদের আশ্রয় নয়—সংগ্রাম ক্ষেত্রেও তারা দাঁড়াতে পারে শত্রুর সম্মুখে পুরুষের সাথে।

সেবায় নারী—আজাদ হিন্দ বাহিনীতে প্রবাসী ভারতীয় নারীগণ ডাঃ লক্ষ্মী স্বামীনাথনের নেতৃত্বে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে উঠল। ভারতের নারী গিয়ে দাঁড়াল পুরুষের পাশে,—তাদের দেবে আশা—দেবে উদ্দীপনা,—রোগ শয্যায় মুছিয়ে দেবে রুগ্নের

বেদনা, তারা অভয় দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলবে। ওরা সব ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গেলের দল—লক্ষ্মী স্বামীনাথন আর বেলা দত্ত, রেবা সেন আর মিস ভট্টাচার্য্য। লক্ষ্মী স্বামীনাথন্ ডাক্তার,—তাঁর প্রধান কাজ হল হাঁসপাতালে। কুমারী বেলা দত্তের বয়স ষোল। তার উপর দেওয়া হল আর এক হাঁসপাতালের দায়িত্ব। দিনের পর দিন সে চলে শুশ্রূষা করে, ঝাঁকে ঝাঁকে শত্রু বিমান বোমা বর্ষণ করে যায় মাথার উপর দিয়ে। অনেকে সরে গেল নিরাপদ আশ্রয়ে। কিন্তু সে যাবে কেমন করে তার রুগ্ন ভাইদের ফেলে? মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে সে বোমা বর্ষণ উপেক্ষা করে চলল রোগীদের সেবা করে। শেষে একবার তাকে উদ্ধার করা হল এক ধ্বংসস্তূপের ভিতর থেকে।

যুদ্ধে নারী—কিন্তু শুধু রুগ্ন আর আহতদের পরিচর্যা করে নারীরা তৃপ্তি পেল না। তারা চায় ভাইদের পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে—তারা জানে অস্ত্র ধরতে—সে শিক্ষা নেতাজী তাদের দিয়েছেন তাই আঙ্গুল কেটে তারা নেতাজীর কাছে লিখে পাঠান রক্তের লিখন।

তাদের সে আবেদন মঞ্জুর হল। সিপাহী বিদ্রোহের বীরাঙ্গনা রাণী লক্ষ্মীর নামে গড়ে উঠল "ঝাঁসীর রাণী বাহিনী" স্বাধীনতার অদম্য আকাঙ্খায় আজ তারা নববলে বলীয়ান। তারা জানে সে পথ বন্ধুর—সে পথে আসবে দুঃখ—আসবে মৃত্যু। কিন্তু তা বলে ত বসে থাকলে চলবে না—সে পথই যে মুক্তির পথ। তারা পায়ে পরল রবারের বুট, শাড়ীর বদলে গায়ে উঠল

ফুলপ্যাণ্ট আর খাকি সার্ট, মাথায় ফেটিস টুপি।…"ঝাঁসীর রাণী বাহিনী" যুদ্ধ করে ইম্ফলের সমতল ক্ষেত্রে আর আসামের বনে বনে। নারীসেনাদল মৌলমেনের নিকট প্রায় ১৬ ঘণ্টা মিত্রপক্ষের সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করে ও আহত হয়। মিত্রবাহিনী ভারী কামান এবং অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা যুদ্ধ করে কিন্তু নারীবাহিনী রাইফেল ও বুলেট দ্বারা যুদ্ধ চালায় এবং মিত্র বাহিনীর গতি রোধ করে। মাতৃভূমির কোলে এসে তারা দাঁড়াল কিন্তু ভাগ্য বিপর্যয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা তাদের চলল না—হট্‌তে হ'ল। তাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল ; বিদেশী শক্তির সাথে যুদ্ধে নিতে হল পরাজয় বরণ করে। কিন্তু সত্যই কি তারা পরাজিত ? যে দুঃখ লাঞ্ছনা তারা বরণ করেছে তার কোনও মূল্যই কি তারা পাবে না ? ভারতের ঘরে ঘরে তাদের স্মৃতি চিরদিনের জন্য আঁকা হয়ে থাকবে।

স্বাধীনতার যুদ্ধে বীর অধিনায়কগণ

রাসবিহারি বসু

রাসবিহারী প্রথম অবস্থায় পূর্ব্ব এশিয়ায় ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনা করিয়াছিলেন। বিপ্লবী রাসবিহারী বসু ১৯১২ সালে দিল্লীতে বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের প্রতি বোমা নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাঁহার সহকর্ম্মী অবোধবিহারী লাল ও মাষ্টার আমিরচাঁদ ১৯১৪-১৫ সালে দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। শ্রীযুত বসুকে গ্রেপ্তারের জন্য বার হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। ইহার পর তিনি বারাণসী ও লক্ষ্ণৌ হইতে বিপ্লবাত্মক কার্য্যকলাপ পরিচালনা করেন। ১৯১৫ সালে তিনি ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া জাপানে গিয়াছিলেন। চীন হইতে তিনি ভারতবর্ষে অস্ত্র প্রেরণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু বৃটিশ পুলিশ উহার সন্ধান পাইয়া অস্ত্রগুলি বাজেয়াপ্ত করে। শ্রীযুত বসু অতঃপর আট বৎসর আত্মগোপন করেন। ইহার পর তিনি জাপানে ভারতীয় স্বাধীনতা লীগ পরিচালনা করেন। ভারতবর্ষ সম্পর্কে তিনি জাপানী ভাষায় পাঁচখানা গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ভারতবর্ষ সম্পর্কে জাপানে অনেক আন্দোলন চালান। জাপানে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি অর্থ সংগ্রহ করেন। তিনি বাস্তবিক নির্ব্বাসিতের জীবনযাপন করিতেছিলেন। তিনি এক জাপানী রমণীকে বিবাহ করেন। তাঁহার মৃত্যুতে একজন বিশিষ্ট ভারতীয় বিপ্লবীর জীবনের অবসান ঘটিয়াছে।

রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ

রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ হাথরাসের রাজা হরনারায়ণ সিংহের পুত্র এবং মুরসানের রাজা বাহাদুর ঘনশ্যাম সিংহের দত্তক পুত্র। ১৮৮৬ সালে মহেন্দ্র প্রতাপের জন্ম হয়।

হাথরাসের রাজা অধিকাংশ সময় বৃন্দাবনে থাকিতেন। মহেন্দ্র প্রতাপ পিতার সহিত এই বৃন্দাবনেই বাল্যকাল অতিবাহিত করেন। বাল্যেই বীর পুরুষদের কাহিনী পড়িয়া তাহার মনে স্বাধীনতার আকাঙ্খা প্রবল হয়।

সাড়ে নয় বৎসর বয়সের সময়ে মহেন্দ্র প্রতাপের পিতার মৃত্যু হয় এবং সমস্ত রাজ্য এবং তাঁহার ভার কোর্ট ওব ওয়ার্ডসে চলিয়া যায়। মহেন্দ্র প্রতাপ আলিগড় কলেজ হইতে এফ এ পাশ করেন এবং বি এ শ্রেণীতে ভর্তি হন। পাঠ্যাবস্থায় তিনি সহপাঠীদের নায়ক ছিলেন। ১৬ বৎসরের সময় ঝিন্দ রাজার ছোট ভগ্নীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তিনি ১৮ বৎসর বয়সে স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া পশ্চিমের জ্ঞান আহরণের জন্য ইউরোপ ভ্রমণে বাহির হন। দেশে ফিরিয়া তিনি একসঙ্গে পুঁথিগত ও কারিগরী শিক্ষা দিবার জন্য বৃন্দাবনে তাঁহার পত্নীর নামানুসারে প্রেমমহা বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

১৯০৯ সালের মে মাসে তিনি এই বিদ্যালয়ের জন্য প্রায় দশ লক্ষ টাকা মুল্যের পাঁচখানা গ্রাম এবং বৃন্দাবনের রাজপ্রাসাদ দান করেন। তারপর তাঁহার বাকী সম্পত্তির আয় হইতেও

তিনি বিদ্যালয়কে সাহায্য করিতেন এবং গরীব বিদ্যার্থীকে পালন করিতেন। সময়ে সময়ে বনে জঙ্গলে পাহাড়ে গিয়া তাঁবু পাতিয়া তিনি ছেলেদিগকে প্রকৃতির সহিত পরিচয় করাইতেন।

তিনি অহিংসায় বিশ্বাস করিতেন এবং তাঁহার অস্ত্রশস্ত্র সরকারকে ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। আয়ুর্ব্বেদকে তিনি খুব উচ্চ স্থান দিতেন।

তিনি বিনাসর্ত্তে বৃন্দাবন সহরের বাহিরের কয়েকটি বাগান ও জমি আর্যসমাজের গুরুকুলকে দান করেন। ঐ জমির মূল্য হইবে ১৫০০০ টাকা। তিনি অস্পৃশ্যতা ঘৃণা করিতেন। তিনি মেথরদের সহিত একত্র বসিয়া আহার করেন।

১৯১২ সালে দ্বিতীয়বার তিনি ইউরোপ ভ্রমণ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়া প্রেমমহা বিদ্যালয়ের ভিতর দিয়া সংগঠনকার্য্য আরম্ভ করেন। ১৯৪৪সালে তৃতীয়বার তিনি ইউরোপ যাত্রা করেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তিনি জার্ম্মাণীর কাইজারের নিকট এবং আফগানিস্থানে আমীরের নিকট আসেন। সেই হইতে ভারত সরকার মহেন্দ্র প্রতাপের ভারত আগমন বন্ধ করিয়া দেন। আফগানিস্থানের এজেণ্ট হিসাবে তিনি পৃথিবীর নানাদেশ পর্য্যটন করিয়াছিলেন।

বার্লিনে অবস্থানকালে World Federation নামক একখানা ইংরেজী কাগজ তিনি সম্পাদনা করিতেন। তিনি ভারতের নানা ইংরেজী কাগজে, Young India তে তিনি অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি কংগ্রেসকে সমর্থন করিতেন।

এই যুদ্ধের পূর্ব্ব হইতে তিনি জাপানে ছিলেন। তিনি আফগানিস্থানের প্রজা বলিয়া নিজেকে বিবেচনা করেন। তিনি পৃথিবীর সমস্ত জাতিকে লইয়া একটি সমবায় গঠনের পরিকল্পনা করেন। জেনারেল ম্যাকআর্থার আর্য্যবাহিনী নামে পরিচিত ভারতীয়গণের সভাপতিরূপেই তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবার আদেশ দিয়াছেন। দীর্ঘ এবং শীর্ণকায় রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের মুখমণ্ডল গুম্ফ ও শ্মশ্রু মণ্ডিত। তিনি চশমা পরিয়া থাকেন। বর্ত্তমানে তাঁহার বয়স ৬০ বৎসর হইবে।

জগন্নাথ রাও ভোঁসলে

তিনি মহারাষ্ট্রের তিরোদ গ্রামে ১৯০৬ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ভারত গৌরব শিবাজীর বংশধর। তিনি দেরাদুনের প্রিন্স অফ ওয়েলস সামরিক বিদ্যালয়ে ও ১৯২৬ সালে ইংলণ্ডের 'স্যাণ্ডহার্ষ্ট' সামরিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত হন। ১৯২৮ সালে ভোঁসলেজী কোয়েটাতে ল্যাঙ্কা-শায়ার রেজিমেণ্টে পরে মারহাট্টা পদাতিক দলে কাজ করেন।

১৯৩৭ সালে ভোঁসলে ক্যাপ্টেন হন এবং সম্রাটের মুকুটোৎসবে যোগ দেন। তিনি বীরত্বের জন্য একটি পদক পান। ভারতবাসীদের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম সেনাপতির কাজ শিক্ষা করিবার জন্য মনোনীত হন। পরে তাঁহাকে লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেলরূপে সিঙ্গাপুরে পাঠান হয়।

সিঙ্গাপুরের দূরবস্থার পর ভোঁসলে আজাদ হিন্দ ফৌজে

যোগদান করেন এবং সৈন্যাধ্যক্ষরূপে সর্ব্বোচ্চ পদে তিনি অভিষিক্ত হন। তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাঁহাকে দিল্লীর লালকেল্লায় আনা হইয়াছে।

জগন্নাথ রাও অভিজাত সর্দ্দার পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার আত্মীয় স্বজন অনেকেই যোদ্ধা। ক্যাপ্টেন ভোঁসলে সিন্ধিয়ার বর্ত্তমান শাসকের আত্মীয়। তাঁহার পত্নী চাঁদকিনো-বাঈও অভিজাত পরিবার সম্ভূতা। জগন্নাথরাওএর তিনটি কন্যা সন্তান বর্ত্তমান—জ্যেষ্ঠের বয়স ১১ বৎসর। তাঁহার স্ত্রী ও কন্যারা বর্ত্তমানে বরোদাতে বাস করিতেছেন। মহৎ চরিত্র ও সরল ব্যবহারের গুণে জগন্নাথরাও সকলের প্রিয়। তিনি একজন বিশিষ্ট ক্রীড়ামোদী। তাঁহার ৭৫ বৎসর বয়স্কা বৃদ্ধা মাতা বর্ত্তমান।

লেঃ কর্ণেল মিস্ লক্ষ্মী স্বামীনাথন

ডাঃ কুমারী লক্ষ্মী স্বামীনাথন ১৯৩৭ সালে মাদ্রাজ মেডিকেল কলেজ হইতে ডিক্রি লাভ করেন। অতঃপর ১৯৪০ সালে তিনি চিকিৎসা ব্যবসা করিবার জন্য সিঙ্গাপুরে গগন করেন। তিনি সিঙ্গাপুরের পতনের পর আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান করিয়া উহার অন্তর্ভূক্ত নারীবাহিনী গঠন করেন। তিনি লেঃ কর্ণেল পদে উন্নীত হইয়া "ঝাঁসীর রাণী" বাহিনীর অধিনায়কত্ব করেন। তাহারা অস্ত্র প্রয়োগের কৌশল শিক্ষা করেন।

শ্রীমতী লক্ষ্মী কিছুকাল কালেওয়ায় চিকিৎসক হিসাবে কাজ করেন। তিনি বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আত্মসমর্পণ

করিয়াছেন। বর্ত্তমানে স্বামীনাথনের বয়স ৩২ বৎসর। তাঁহার পিতা মাদ্রাজের একজন বিখ্যাত ব্যারিষ্টার ছিলেন এবং তাঁহার মাতা শ্রীযুক্তা আম্মু স্বামীনাথন সুপরিচিতা। ইনি সম্প্রতি ভারতীয় কেন্দ্রীয় পরিষদে সদস্যা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এই বীরাঙ্গনার বাল্যে নানারূপ বিদ্যার ও কলার্চ্চার প্রতি অনুরাগ ছিল। তিনি বিশিষ্টা ক্রীড়ামোদী এবং অসামান্যা রূপবতী। তিনি বিমানচালক জনৈক ব্রাহ্মণযুবকের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইতে মনস্থ করেন। কিন্তু গার্হস্থ্য-জীবনের আকর্ষণ তাঁহার কাছে নিষ্প্রভ হইয়া যায়। তিনি অবিবাহিত থাকিতেই মনস্থ করেন। বহুগুণবিভূষিতা শ্রীমতী লক্ষ্মীর কংগ্রেসানুরাগ সুবিদিত ছিল।

ক্যাপ্টেন শাহনওয়াজ

পাঞ্জাবের এক প্রসিদ্ধ বংশে ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ খানের জন্ম হয়। তিনি ১১ তম পাঞ্জাব রেজিমেণ্টের অফিসার ছিলেন। তাঁহার পরিবারের ৬২ জন লোক বৃটিশ ভারতীয় বাহিনীতে চাকুরী করেন। আজাদ হিন্দ ফৌজে তিনি কর্ণেলের পদে উন্নীত হন। জানা গিয়াছে যে, তিনিই সর্ব্বপ্রথম ভারত-ভূমিতে মণিপুরে ভারতের জাতীয় পতাকা উড্ডীন করেন। তাঁহার পরিচালিত ডিভিসনের সৈন্যরা স্বতন্ত্রভাবে সংগ্রাম করিতেছিল—জাপানীদের নির্দ্দেশে নহে। ১৯৪৫ সালের ১৭ই মে পেগু রণাঙ্গনে তিনি ধৃত হন।

ক্যাপ্টেন পি কে সাইগল

সাইগল বৃটিশ ভারতীয় বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ১০ম বেলুচি রেজিমেণ্টের অফিসার ছিলেন। তিনি লাহোর হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ অচ্ছুরামের পুত্র। আজাদ হিন্দ ফৌজে তিনি কর্ণেলের পদে উন্নীত হন; তিনি উহার অফিসারদের শিক্ষা দিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

গুরুবক্স সিং ধীলন

ধীলন জাতিতে শিখ, দেখিতে গৌরবর্ণ মধ্যমাকৃতি। তাঁহার পরিবারের অনেকেই সেনাবাহিনাতে কাজ করিয়াছেন। তিনি ১৯১৬ সালে লাহোরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৭ সালে তাঁহার সৈন্য বাহিনাতে তলব পড়ে। তিনি দেরাদুন ও নবাবগঞ্জ সামরিক বিদ্যালয় হইতে সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া ১।১৪ পাঞ্জাব রেজিমেণ্টের অন্তর্ভুক্ত হন। ১৯৩৯ সালে যুদ্ধ বাধিলে তাঁহাকে এবং তাঁহার রেজিমেণ্ট মালয়ে পাঠান হয়। মালয়ের যুদ্ধে তিনি অসীম সাহস ও রণনৈপুণ্য দেখান। আত্মসমর্পণের পর তিনি মেজর মোহন সিং কর্ত্তৃক গঠিত ভারতায় জাতীয় বাহিনীতে যোগদান করেন।

ক্যাপ্টেন ধীলন বিবাহিত কিন্তু তাঁহার কোন সন্তানাদি নাই। তাঁহার পিতা পশু-চিকিৎসক হিসাবে সেনাবাহিনীতে ২২ বৎসর কাজ করিবার পর বর্ত্তমানে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার আরও দুই ভাই সেনাবাহিনীত কাজ

করিতেছেন এবং চতুর্থ ভ্রাতা ডেপুটি-ফরেষ্ট রেঞ্জারের পদে নিযুক্ত আছেন।

আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার

বিচারালয়—দিল্লীর ইতিহাস-প্রসিদ্ধ লাল কেল্লার দ্বিতল হল ঘরে গত ৫ই নভেম্বর প্রথম সামরিক আদালত বসে। কেল্লার দক্ষিণ প্রান্তে ইহা অবস্থিত। নিম্নতলে একটি অংশে সাংবাদিকগণের কক্ষ (Press room) নির্দিস্ট হইয়াছিল। হলটির দৈর্ঘ্য ৬০ ফুট ও বিস্তৃতি ২৫ ফুট। হলটির তিন দিকে প্রশস্ত বারান্দা আছে।

মঞ্চে বিচারকগণের আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। আসামী পক্ষের কৌসুলিগণ মঞ্চের সম্মুখে বসেন। দড়ি দ্বারা ঘেরা স্থানে সংবাদিকগণ বসেন। হলের বাকি অংশ দর্শকগণের জন্য বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। কেল্লায় প্রবেশাধিকার সীমাবদ্ধ ছিল।

পাশ ব্যতীত বিচারের সহিত সংশ্লিষ্ট স্পেশাল ব্যক্তিদের ছাড়া অন্য কেহ কেল্লায় প্রবেশ করিতে পারিবেন না। বাহিরের লোকের জন্য দুই শত আসনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। একটি 'এমপ্লিফায়ারের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। প্রথম দিন সকলের ফটো নিয়া হয়।

বিচারক ও উকিল—কংগ্রেস কর্ত্তৃক যে আসামী পক্ষসমর্থন-

কারী কমিটি গঠিত হয় তাহাতে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, স্যার তেজবাহুর সপ্রু, লাহোর হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি কুনোয়ার স্যার দিলীপ সিংহ, শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই, মিঃ আসফ আলী, রায় বাহাদুর বদ্রীদাস, পাটনা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি মিঃ পি কে সেন এবং শ্রীযুক্ত রঘুনন্দন শরণ ছিলেন। স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু, শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই আদালতে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পক্ষ সমর্থন করেন। জওহরলাল ২২ বৎসর পরে ব্যারিস্টারের পোষাক পরিলেন। ভারতীয় বাহিনীর সাতজন অফিসার লইয়া সামরিক আদালত গঠিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে চার জন ইউরোপীয় এবং তিন জন ভারতীয় ছিলেন যথা মেজর জেনারেল এ বি ব্ল্যাক্সল্যাণ্ড, ব্রিগেডিয়ার এ জি এইচ হার্ক, লেঃ কর্ণেল সি আর স্কট, লেঃ কর্ণেল টি আই ষ্টিভেনসন, লেঃ কর্ণেল নাসির আলীখাঁন, মেজর বি প্রীতম সিংহ এবং মেজর বনোয়ারীলাল। সরকার পক্ষে মামলা পরিচালনা করিলেন এডভোকেট জেনারেল স্যার এন, পি, ইঞ্জিনিয়ার ও মিলিটারি প্রসিকিউটর মেজর ওয়াল্‌স।

বিচারকগণের শপথ গ্রহণ করিতে প্রায় অর্ধঘণ্টা সময় লাগে। তাঁহারা এ শপথও করেন যে কর্তৃপক্ষ প্রকাশ না করা পর্য্যন্ত তাঁহারা এই সামরিক আদালতের রায় প্রকাশ করিবেন না এবং কোন সামরিক আদালতে সাক্ষ্যদানের প্রয়োজন ছাড়া অন্য কারণেও তাঁহারা এই সামরিক আদালতের কোন বিচারকের কেন মতামত বা ভোট প্রকাশ করিবেন না।

আসামী—ক্যাপ্টেন নওয়াজ, ক্যাপ্টেন পি, কে, সাইগল এবং লেঃ গুরুচরণ সিং ধীলন, আবদুল রসিদ (১।১৪'শ পাঞ্জাব রেজিমেণ্ট), সুবেদার শিঙ্গারা সিংহ (৫।১৪ শ' পাঞ্জাব রেজিমেণ্ট), জমাদার ফতে খাঁ (৫।১৪'শ পাঞ্জাব রেজিমেণ্ট)। ইঁহাদের শেষোক্ত তিনজনকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৭নং এবং ৩২৯নং ধারা অনুসারেও (সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য লোককে বাধ্য করিবার উদ্দেশ্যে গুরুতর আঘাত করা) অভিযুক্ত করা হইয়াছে। ইহাদের বিচার দ্বিতীয় আদালতে অন্যত্র হইতেছে। প্রথম আদালতে বিচারকগণ মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন, মঞ্চের পাদদেশে প্রথম তিন জন আসামী সারি দিয়া দাঁড়ান। আসামীদের পরিধানে ইউনিফরম ছিল। কিন্তু পদের বৈশিষ্ট্য-জ্ঞাপক নিদর্শন খুলিয়া লওয়া হইয়াছিল। জিজ্ঞাসিত হইলে আসামীগণ বিচারক ও সরকারী রিপোর্টারের বিরুদ্ধে কোন আপত্তি করেন না।

সরকারী অভিযোগ

ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২১ ধারা অনুযায়ী প্রথম তিনজন আসামীকেই রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া ১৯৪৫ সালের অনুমান ৬ই মার্চ্চ তারিখে ব্রহ্মের পোপাপাহাড়ের নিকটে হরি সিংহ, দুলিচাঁদ, দারে দারিপ সিংহ এবং ধরম সিংহকে হত্যার অভিযোগও লেঃ ধীলনের বিরুদ্ধে উপস্থিত করা হইয়াছে। এই ব্যক্তিদের

হত্যাকার্য্যে লেঃ ধীলনকে সহায়তা করিবার অভিযোগও ক্যাপ্টেন সেহগলের বিরুদ্ধে আনীত হইয়াছে। আর গোলন্দাজ মহম্মদ হোসেনের হত্যাকার্য্যে খাজিনশাই এবং আয়া সিংহকে সাহায্যে করিবার অভিযোগেও ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ অভিযুক্ত হইয়াছেন। বিদাদারী, সেলেতার, ক্রাঞ্জি ক্যাম্পে যে সকল ভারতীয় যুদ্ধ বন্দী ছিল তাহাদিগকে আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান করিতে বাধ্য করিবার জন্য অত্যাচার ও নির্যাতন করার অভিযোগও আছে।

বিচারের ফল—প্রায় দুই মাস বিচার চলিবার পর সকল আসামীই রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অভিযোগে দোষী সাব্যস্থ হন। মহামান্য জঙ্গীলাট আসামীদিগকে ছাড়িয়া দেন ; কেবল তাঁহাদের বাকী বেতন ও ভাতা বাজেয়াপ্ত করেন।

আজাদ হিন্দ ফৌজের পরবর্ত্তী সংবাদ—(ক) আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা মনে রাখা দরকার :—(১) আজাদ হিন্দ ফৌজ পেশাদার রাজনীতিবিদ্ বা বিপ্লবী দিয়া গঠিত নয়। যে সব লোক ব্রিটিশ সৈন্যবিভাগে বিশ্বস্ত সৈনিক ছিল এবং যাহাদের আত্মীয় স্বজন এখনও ব্রিটিশের দাসত্ব করিতেছে সেই সব লোকই ফৌজে যোগ দেয়। (২) তাঁহারা জাপানীদের তাঁবেদার বেতনভুক সৈন্য ছিল না। (৩) ১৯৪২ সালে এপ্রিলে জাপানীদের অপসারণের সময় ৫০০০ আজাদি সৈন্য রেঙ্গুণে আইন ও শৃঙ্খলা এবং ভারতীয়দের ধনসম্পত্তি রক্ষা করে। আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের অধীনে ভারতীয়গণকে

পৃথক জাতি হিসাবে জাপানীরা গণ্য করিত। ভারতীয়গণ কতকগুলি ব্যবসায়ে একচেটিয়া অধিকার লাভ করে।

(খ) I. N. A. (Indian National Army) নাম বদলাইয়া আজাদ হিন্দ ফৌজ রাখা হয় কারণ ইংরাজরা I, N. A, কে Imperial Nippon army বলিতে আরম্ভ করে।

(গ) ফৌজে প্রায় তিন লাখ সৈন্য ভর্ত্তি হয় কিন্তু হাতিয়ার না থাকায় উহাদিগকে সজ্জিত করা হয় না। আজাদি সৈন্যদের মধ্যে কোন সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি ছিল না। হিন্দু মুসলমান সব একসঙ্গে একই পাত্র থেকে এক পাত্রে চুমুক দিয়ে খেত। রান্না এক জায়গায় হত। ধর্ম্ম তাদের একত্র করে নাই। দেশকে স্বাধীন করবার উত্যগ্র আকাঙ্ক্ষা ধর্ম্মের ভেদকে ভুলিয়ে দিয়েছিল। সাধারণ সৈন্যের সঙ্গে অফিসারের সঙ্গে কোন ভেদাভেদ ছিল না, একই সঙ্গে খাওয়া দাওয়া চলিত। অথচ সৈন্যদের মধ্যে নিয়মানুবর্ত্তিতা শৃঙ্খলা আদর্শ স্থানীয় ছিল।

(ঘ) আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের ও গভর্ণমেণ্টের মধ্যে সম্পর্ক — আজাদ হিন্দ সঙ্ঘ মূল প্রতিষ্ঠান। আজাদ গভর্ণমেণ্ট ও ফৌজ ইহার অধীনে ছিল। এই তিনটারই প্রেসিডেণ্ট ছিলেন নেতাজী। রাস বিহারী বসুর নেতৃত্বে সঙ্ঘের সদস্যদের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হয়। রাসবিহারী ও রাঘবন ছিলেন অসামরিক লোক সেইজন্য আজাদি ফৌজ তাহাদিগের নেতৃত্ব প্রথমে মানিতে চায় নাই। এইজন্য সঙ্ঘের ও ফৌজের কাজে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। সুভাষ চন্দ্রের আগমনে এই সব গণ্ডগোল দূর হয়। তিনি সঙ্ঘ ও ফৌজের

সম্পর্ক স্থির করিয়া দেন এবং আজাদি গভর্ণমেণ্ট গঠন করেন। সঙ্ঘই ফৌজ ও গভর্ণমেণ্টের জন্য অর্থ যোগাইত। ফৌজের জন্য অসামরিক ব্যক্তিগণকে স্বেচ্ছাসেবক শ্রেণীভুক্ত করিত। ফৌজের সমস্ত সমরোপকরণ মূল্য দিয়া ক্রয় করা হইত। সঙ্ঘই ফৌজের দ্রব্যাদি সরবরাহ করিত। সুভাষের আগমনে বহু অসামরিক ব্যক্তি ফৌজে যোগ দেন। গভর্ণমেণ্টের সৈন্য সরবরাহ, অর্থ, অর্থনৈতিক, প্রচার, মহিলা, সমাজ কল্যাণ, সংস্কৃতি. জ্ঞানানুশীল বিভাগ ছিল। সঙ্ঘ ও গভর্ণমেণ্ট একটি সুশাসিত নিয়মবদ্ধ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ছিল।

(ঙ) নেতাজীর জীবন নাশের চেষ্টা—১৯৪৪ ফেব্রুয়ারীতে নেতাজীর জীবন নাশের দুইবার চেষ্টা হয়। সিঙ্গাপুরে নেতাজীর বাড়ীতে দুইদল প্রহরী থাকিত। বাহাদুর গ্রুপের বিশম্ভর দয়াল রক্ষীদের নেতা ছিলেন। প্রাঙ্গনের বাহিরে পাঁচজন য়ুফর্মি পরিহিত প্রহরী থাকিত, ভিতরে আটজন পোষাক পরিহিত প্রহরী থাকিত। ঘণ্টায় ঘণ্টায় প্রহরীদের বদল হইত। একদিন রাত্রে একজন অজ্ঞাতনামা লোক প্রহরীদের দলের মধ্যে ঢুকিয়া যায়। রক্ষীর দলপতির সন্দেহ হওয়াতে প্রহরীদের লাইনে দাঁড় করান হয় এবং সকলের নাম ও নম্বর বলিতে বলা হয়। তখন নূতন লোকটি ধরা পড়ে। তাহার হাতে রিভলভার ছিল। তাহাকে আটক করা হয়। সে স্বীকার করে যে সে নেতাজীকে হত্যা করিতে আসিয়াছিল। নেতাজীর আদেশে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। আর একজন লোক একদিন

নেতাজীকে সংবাদ দেয় যে রাসবিহারী বসু মোটরে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে এসেছেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্র জানিতেন যে রাসবিহারী বসু তখন সিঙ্গাপুরে আসিতে পারেন না, তিনি জাপানে ছিলেন। লোকটি ফিরিয়া আসিয়া দেখে প্রাঙ্গণ হইতে মোটর উধাও হইয়াছে।

(চ) **ব্যাঙ্ক ও আয়**—একটি সভায় নেতাজীর মুহূর্তের আবেদনে রেঙ্গুনের একজন মুসলমান বণিক নিজেই এক কথায় ৩০ লক্ষ টাকা দান করেন এবং এক সপ্তাহের মধ্যে ২০ লক্ষ টাকা তুলিয়া দেন। আজাদ National ব্যাঙ্ক বর্মার আইনানুসারে রেজিষ্টারি হয়। এই ব্যাঙ্কের মারফত ব্যবসায়ী কারবার চালাইত। এই ব্যাঙ্কের চেক নোটের মত গণ্য হইত। সাধারণে ইহার ঐরূপ মূল্য দিত। পনর দিনের মধ্যে ব্যাঙ্কের তিনটি শাখা খোলা হইয়াছিল। ব্রহ্মে বহু কারবারী কালাবাজারে বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করে। নেতাজী তাহাদিগের মূলধনের উপর কর ধার্য্য করিয়াছিলেন। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের এপ্রিলের বিশৃঙ্খলার সময় আজাদ ব্যাঙ্ক বাজারের চলতি মূল্যে সকলকে জিনিষপত্র যোগাইত।

(ছ) **নেতাজীর প্রতি ভক্তি**—নেতাজীকে লোকে কত ভক্তি করিত তার দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি ঘটনা বিবৃত করিতেছি। একদিন নেতাজীকে রেঙ্গুন হইতে সিঙ্গাপুরে উড়োজাহাজে উঠিবার সময়ে খুব বিষন্ন দেখাইতেছিল। উড়োজাহাজ ছাড়িবার মাত্র দশ মিনিট দেরী আছে। একজন চেটিয়ার মাদ্রাজী বণিক তার

বিষণ্ণতার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। নেতাজী তদুত্তরে বলেন "কারণ কি রেঙ্গুনের লোক দূর করিতে পারিবে। আজাদ হিন্দ ফৌজের জন্য আমার ২০ লক্ষ টাকা এখুনি দরকার"। আশ্চর্য্য! চেটিয়ার বণিক দশ মিনিটের মধ্যে ২০লক্ষ টাকা তুলিয়া দিলেন।

(জ) **নেতাজীকে সোনায় ওজন**—বর্মা, ভারতীয় ও মালয়ের অধীবাসি নেতাজীকে চার বার সোনা দিয়া ওজন করেন এবং সেই সোনা আজাদ হিন্দ ফৌজের জন্য ব্যয়িত হয়। নেতাজীর ওজন আন্দাজ দুই মণ হইবে।

(ঝ) **জার্ম্মানীতে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন** নেতাজী জার্ম্মাণিতে পৌঁছিবার পর ১৯৪২ সালে ২৬শে জানুয়ারী ১৫০০ জন ভারতীয় সৈন্য দিয়া জার্ম্মাণিতে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠিত হয়। জার্ম্মাণিরা ইহাকে 'ফ্রীজ ইণ্ডিয়ান' বলিত। ক্রমশঃ বহু লোক ইহাতে যোগ দেয়। এই সকল সৈনা লইয়া একটি ব্রিগেড গঠিত হয়। ব্রিগেডটি ১৫টা কোম্পানীতে বিভক্ত হয়। মোট সৈন্য সংখ্যা ৩৫০০ জন ছিল। ইহাদের মধ্যে স্মল আর্মস, 'হেভী আর্মস', 'স্যাপার্স', 'মাইনার্স', হেভী এন্টিট্যাঙ্ক গানস, ইনফ্যান্ট্রি গান্‌স, ইণ্ডিয়ান আর্টিলারি কোম্পানি ছিল। ইহাদিগকে হল্যাণ্ডে প্রথম ডিফেন্স লাইনে, দক্ষিণ ফ্রান্সে বোর্দো অঞ্চলে ও লারোসেলে নিয়োজিত করা হয়। ইহারা আত্মসমর্পণ করে। লেঃ যশোবন্ত সিংহের অধীনে এক ব্যাটালিয়ান ইটালিতে নিয়োজিত হয়। নেতাজীর নির্দ্দেশে জার্ম্মান গভর্ণমেণ্ট ইহাদিগকে রণ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় সুশিক্ষিত করে এবং ইহাদিগকে

রুশিয়ার বিরুদ্ধে নিয়োজিত করা হয় না। ইহারা হিটলারের ঠিক তাঁবেদার ছিল না। আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্ট জার্ম্মানিতে নিজস্ব নীতি অনুসারে কাজ করিতেন। এখানে আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। মিঃ হাসদান, মিঃ হামিল খাঁ, মিঃ গুরুচরণ সিং লেঃ আলী খাঁ প্রভৃতি গভর্ণমেণ্টের বিশিষ্ট সদস্য।

নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু

১
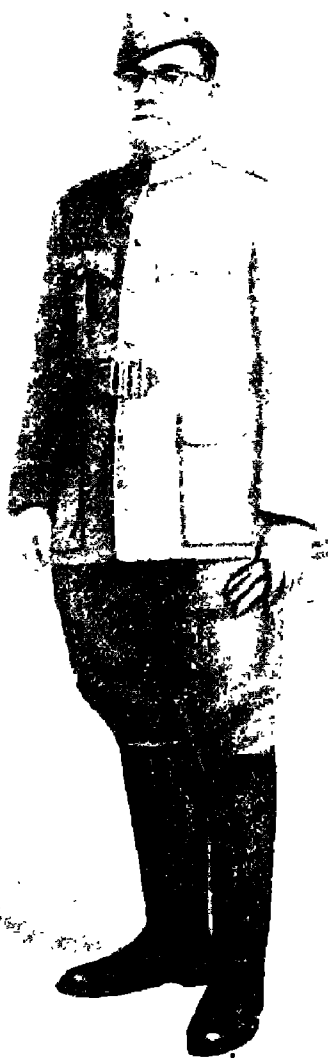
আজাদ হিন্দ ফৌজের জন্য নেতাজীর বিভিন্ন ঘোষণা, নির্দ্দেশনামা ও বাণী

আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের ঘোষণা

শোনান, ২১শে অক্টোবর ১৯৪৩ সাল .

"১৭৫৭ সালে বাঙলাদেশে বৃটিশের হাতে প্রথম পরাজয়ের পর ভারতবর্ষের জনগণ একশত বৎসর ধরে বিরামহীন প্রচণ্ড সংগ্রাম চালিয়েছে।............

সিরাজদ্দৌলা, বাঙালার মোহনলাল, হায়দরালী, টিপু সুলতান, দক্ষিণ ভারতের ভেলু তাম্পি, আপ্পাসাহেব ভোঁসলে, মহারাষ্ট্রের পেশোয়া বাজীরাও, অযোধ্যার বেগম, পাঞ্জাবের সর্দার শ্যাম সিংহ আত্রিওয়ণ, ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ, তাঁতিয়াটোপি, ডুমরাওয়নের মহারাজ কুনোয়ার সিং, নানা সাহেব এবং আরো বহু বীরের গৌরবপূর্ণ নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রয়েছে।

১৮৫৭ সালের পর বৃটিশ কর্তৃক নিরস্ত্র হ'য়ে সমগ্র ভারতের জনগণ কিছুকাল হতাশ এবং বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল। কিন্তু ১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের জন্মের পর ভারতীয়দের অন্তরে নবজাগরণের ঢেউ লাগল। ....পরিশেষে ১৯২০ সালে...মহাত্মা গান্ধী অসহযোগিতা ও আইন অমান্যরূপ......নতুন আন্দোলন আরম্ভ করেন

এরপর বিশ বছর চলে গেল। এ সময়ের মধ্যে ভারতীয়গণ নানা প্রকার দেশপ্রেমমূলক কাজ করেছে।……ভারতবাসী শুধু রাজনৈতিক চেতনাই লাভ করল না তারা একটি অখণ্ড রাজনৈতিক সত্তায় পরিণত হল।

এমনিভাবে বর্তমান সামগ্রিক যুদ্ধের প্রাক্কালে ভারতের মুক্তির শেষ সংগ্রামের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত হল।………

"পরিপূর্ণ সমরায়োজন" ধ্বনিতে অনুপ্রাণিত হয়ে পূর্ব এশিয়ায় আজ বিশলক্ষাধিক ভারতীয় এক সুসংবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে সম্মিলিত হয়েছে। তাদের সম্মুখে রয়েছে—ভারতের আজাদ হিন্দ ফৌজ—তাদের মুখে দৃঢ়তাপূর্ণ বুলি হল —**দিল্লী চলো**।

কপটতা ও ভণ্ডামীদ্বারা বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী ভারতীয়দের শুভেচ্ছা ও সহানুভূতি হতে বঞ্চিত হয়েছে। এক্ষণে বৃটিশরাজ অতীব সঙ্কটজনক পরিস্থিতির মধ্যে অবস্থান করছে। মাত্র একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের প্রয়োজন এই অপ্রীতিকর শাসন ব্যবস্থার শেষ চিহ্ন লোপ করবার জন্য। আজাদি ফৌজের উপরই ভার পড়েছে সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সৃষ্টির। স্বদেশে অসামরিক জনগণের এবং বৃটিশ সরকার গঠিত ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর বহু লোকের বিপুল সমর্থনে, বিদেশে আমাদের অজেয় মিত্রবর্গের সহায়তায় এবং আত্মশক্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে ভারতীয় আজাদী ফৌজ তাদের ঐতিহাসিক ভূমিকায় সফলতা লাভ করবে বলে একান্তভাবে বিশ্বাস করে।

স্বাধীনতা আসন্ন। আজ প্রত্যেক ভারতবাসীর কর্তব্য একটি অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট গঠন করে তারই পতাকাতলে সমবেত হয়ে স্বাধীনতার শেষ সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া। কিন্তু ভারতের প্রতিটি

নেতা আজ কারাগারে ; জনসাধারণ নিরস্ত্র, এমতাবস্থায় ভারতে অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট গঠন করা অথবা সে গভর্ণমেণ্টের পরিচালনায় সশস্ত্র বিপ্লব সংগঠন করা সম্ভব নহে। সে জন্যই পূর্ব এশিয়ার স্বাধীনতা লীগের কর্তব্য হল স্বদেশ ও বিদেশের সকল দেশ প্রেমিকের সমর্থনে স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট গঠন করা। আজাদ হিন্দ ফৌজের সাহায্যে স্বাধীনতার শেষ সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে।

"ভারতীয় স্বাধীনতা লীগ" এক্ষণে পূর্ব এশিয়ায় আজাদ হিন্দের অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট গঠন করেছেন। এখন আমরা পরিপূর্ণ দায়িত্বজ্ঞান নিয়ে কর্তব্যে অবতীর্ণ হচ্ছি। ভগবানের নিকট প্রার্থনা, আমাদের কার্যের মধ্যে ও মাতৃভূমির মুক্তি সংগ্রামের ভিতর তাঁর অনাবিল আশীর্বাদধারা বর্ষিত হোক। আজ আমরা এই ঘোষণাদ্বারা আমাদের সকল সাথী ও সহকর্মীর জীবন পণ করছি দেশমাতৃকার জন্য, কল্যাণের জন্য, এবং বিশ্বের দরবারে তাঁকে গৌরবে উচ্চশিখরে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য।

অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের প্রধান কর্তব্য হল ভারতভূমি হতে বৃটিশ ও তার মিত্রদের বিতাড়িত করবার জন্য সংগ্রাম পরিচালনা করা। এরপর অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের কর্তব্য, জনগণের ইচ্ছানুসারে এবং তাদের বিশ্বাস ভাজন স্থায়ী জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করা। বৃটিশ এবং তার মিত্রবর্গ বিতাড়িত হওয়ার পর যতদিন পর্যন্ত স্থায়ী জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত না হবে ততদিন অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট জনগণের পরিপূর্ণ বিশ্বাসভাজন হয়ে দেশের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করবে।

এই গভর্ণমেণ্ট ধর্মগত স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, এবং সমস্ত অধিবাসীর সমান অধিকার ও সমান সুযোগ সুবিধার দাবী স্বীকার করে। এই গভর্ণমেণ্ট ঘোষণা করছে, বিদেশী সরকার সৃষ্ট সর্বপ্রকার

বিভেদ অতিক্রম করে ইহা দেশের সকল সন্তানকে সমানভাবে পোষণ করবে এবং ইহা দেশের সমস্ত অংশের সুখ-সমৃদ্ধি বিধানের পথে সর্বতোভাবে অগ্রসর হতে দৃঢ় সঙ্কল্প।

ভগবানের নামে, অতীতে যারা ভারতীয় জনগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করে গেছেন তাদের নামে, এবং পরলোকগত যে সকল শহীদ বীরত্ব ও আত্মত্যাগ দ্বারা আমাদের সামনে মহান আদর্শ স্থাপন করে গিয়েছেন তাদের নামে আমরা ভারতীয় জনগণকে আমাদের গর্বোন্নত পতাকাতলে সমবেত হতে এবং স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে অস্ত্র ধারণ করতে আহ্বান জানাচ্ছি। বৃটিশ এবং তার সমস্ত মিত্রদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সংগ্রাম আরম্ভ করবার জন্য আমরা তাদের আহ্বান করছি। যতদিন পর্যন্ত না শত্রু ভারতভূমি হতে চিরতরে বহিষ্কৃত হয় এবং যতদিন পর্যন্ত না ভারতবাসী আবার স্বাধীন হয় ততদিন পর্যন্ত এ লড়াই অনমনীয় সাহস, চরম অধ্যবসায় ও পরিপূর্ণ জয়লাভের প্রত্যয় নিয়ে চালিয়ে যেতে হবে।"

আজাদ হিন্দ সাময়িক গভর্ণমেণ্টের পক্ষে—

সুভাষচন্দ্র বসু (রাষ্ট্রনায়ক, প্রধান মন্ত্রী, সমর ও পররাষ্ট্র সচিব)। ক্যাপ্টেন মিস্ লক্ষ্মী (নারী সংগঠন)। এস্, এ, আয়ার (প্রচার)। লেঃ কঃ এ, সি, চ্যাটার্জি (অর্থ)।

লেঃ কঃ আজিজ আহম্মদ, লেঃ কঃ এন, ভগৎ, লেঃ কঃ জে, কে, ভোঁসলে, লেঃ কঃ এম, জেড্, কিয়ানি, লেঃ কঃ এ ডি লগানাদান, লেঃ কঃ এহ্সান কাদির এবং লেঃ কঃ শাহ নওয়াজ (সৈন্যবাহিনীর প্রতিনিধি)।

এ, এম, সহায় (মন্ত্রীর পদ মর্যাদাসম্পন্ন সেক্রেটারী), রাসবিহারী বসু (প্রধান পরামর্শদাতা), করিমগণি, দেবনাথদাস, ডি এম খাঁ, এ ইয়েলাপ্পা, জে, থিবি, সর্দার ঈশ্বর সিং (পরামর্শদাতাগণ), এ, এন, সরকার (আইন বিষয়ক পরামর্শদাতা)

২

নেতাজী ভারত অভিযানের পূর্বে বীর যোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত বাণী দেন :—

দিল্লী চলো

দূরে বহুদূরে ঐ নদী, অরণ্যপূর্ণ ভূখণ্ড ছাড়াইয়া, পাহাড় পর্বত ছাড়াইয়া আমাদের দেশ—সে দেশে আমরা জন্মেছি। আবার আমরা ফিরে যাচ্ছি আমাদের দেশের মৃত্তিকায়। —ঐ শোন! স্বদেশ আমাদের আহ্বান কচ্ছে—ভারতের রাজধানী দিল্লী আমাদের ডাকছে—আটত্রিশ কোটী আশী লক্ষ দেশবাসী আমাদের জানাচ্ছে তাদের সাদর আহ্বান—পরিজনের ডাক ভেসে আসছে পরিজনদের কাণে। ওঠ, নষ্ট করবার মত সময় আর নেই—তোমাদের জাগতে হবে—হাতে নিতে হবে অস্ত্র। সম্মুখে পড়ে আছে প্রদর্শিত পথ—সে পথ ধরে যেতে হবে এগিয়ে। বিদেশী শত্রুকে পর্য্যুদস্ত করে আমরা অগ্রগামী হব জয়যাত্রার পথে। সে পথে যদি নেমে আসে মৃত্যুর বিধান, শহীদের ন্যায় তাকে আমরা নেব বরণ করে। যে পথে আমাদের বিজয় বাহিনী দিল্লীতে উপনীত হবে মৃত্যুর আগে সেই পথের ধূলায় এঁকে দিব শেষ চুম্বনরেখা। দিল্লীর পথই আমাদের মুক্তির পথ···এগিয়ে চল দিল্লীর পথে।

———

৩

সুভাষচন্দ্র সৈনিকগণকে ভারতভূমিতে পতাকা উত্তোলনের আহ্বান জানাইয়া নিম্নলিখিত বাণী দেন

"বন্ধুগণ, ১৮৫৭ সালের পর এই প্রথমবার আমরা স্বীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিলাম। বিদেশের বহু শক্তিশালী রাষ্ট্র এই গভর্ণমেণ্টকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ১৮৫৭ সালের পর এই প্রথমবার ভারতের বাহিরে বিশেষতঃ ইউরোপ ও এশিয়ার ভারতীয়েরা স্বদেশের স্বাধীনতার যোদ্ধাদের পাশাপাশি দাড়াইয়াছে। ভারতে বিপ্লবের ভিত্তিভূমি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অত্যাচারীর নির্দয় শোষণের ফলে ভারতে দুর্ভিক্ষ ও অনাহারের যে তাণ্ডবলীলা চলিতেছে, তাহাই ভারতবাসিগণকে বিপ্লবের পথে ঠেলিয়া দিতেছে। ভারতের স্বাধীনতার শেষ সংগ্রাম আরম্ভ করার উপযোগী সময় আজ উপস্থিত। স্বদেশে ও বিদেশে অবস্থিত আমার দেশবাসীগণ! আর সময় নষ্ট করিও না। তোমরা প্রস্তুত হও এবং এ মুহূর্তেই শেষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হও। পূর্ব এশিয়ায় শক্তিশালী মিত্ররাষ্ট্রের সাহায্য লইয়া আমরা যথাসাধ্য কাজ করিতেছি। শীঘ্রই আমরা ভারতের সীমান্ত অতিক্রম করিব এবং ভারতভূমিতে স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করিব। অতঃপর দিল্লী অভিমুখে আমাদের ঐতিহাসিক যাত্রা সুরু হইবে। সর্বশেষ ইংরাজটি ভারতবর্ষ ত্যাগ করিলেই এ যাত্রা শেষ হইতে পারে, কিন্তু তাহার পূর্বে নহে। দিল্লীর বড়লাট ভবনে যেদিন আমাদের জাতীয় পতাকা সগৌরবে উড়িতে থাকিবে এবং যেদিন ভারতের মুক্তিফৌজ প্রাচীন লালকেল্লার অভ্যন্তরে বিজয়-উৎসবে মাতিয়া উঠিতে পারিবে—কেবলমাত্র সেদিনই এ অভিযানের শেষ হইবে।"

—সুভাষচন্দ্র বসুর নির্দেশনামা।

৪

ঝাসীর রাণী বাহিনীর উদ্বোধনে সুভাস চন্দ্রের বক্তৃতা

"ঝাসীর রাণী বাহিনীর শিক্ষাকেন্দ্র উদ্বোধন একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এশিয়ার পূর্বাঞ্চলে আমাদের সংগ্রামের অগ্রগতির পথে ইহা একটি স্মরণীয় কাহিনী। এর সুদূর প্রসারী সম্ভাবনা উপলব্ধি করতে হলে আমাদের অন্তরে সকল অনুভূতি দিয়ে মনে রাখতে হবে যে আমাদের এ আন্দোলন, এ সংগ্রাম শুদ্ধমাত্র রাজনৈতিক নয়। আমরা আমাদের মাতৃভূমিকে নতুন করে, নব আদর্শে গড়ে তোলবার মহান কার্য্যে অবতীর্ণ হয়েছি। ভারতের জন্য আমরা নিয়ে আসছি এক নবযুগ, সুতরাং আমাদের নব-জীবনের বনিয়াদ হবে অতীব সুদৃঢ়। আপনারা মনে রাখুন এটা শুধু গলাবাজী নয়। আমরা দেখতে পাচ্ছি ভারতের পুনর্জীবন আসন্ন। ভারতীয় নারীদের মধ্যেও এই নব জাগরণের শিহরণ উঠা স্বাভাবিক।

যে শিক্ষা শিবিরের আজ উদ্বোধন করা হল তাতে আমাদের ১৫৬ জন ভগিনী শিক্ষালাভ করবেন। আমি মনে প্রাণে আশা করি, শোনানে শীঘ্রই তাদের সংখ্যা হবে এক হাজার। থাইল্যাণ্ডে ও ব্রহ্মদেশেও নারী শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় শিবির হল শোনানে। আমি একান্তভাবে বিশ্বাস করি, এক হাজার "ঝাসীর রাণী" এই কেন্দ্রীয় শিবিরে তৈরী হবে।"

৫

নেতাজীর শেষ নির্দ্দেশ বাণী

(আজাদ হিন্দ ফৌজের অধ্যক্ষ ও সৈন্যবৃন্দের প্রতি)

১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারী থেকে যেখানে দাঁড়িয়ে আপনারা বীরের মত সংগ্রাম করে চলেছেন গভীর মর্ম বেদনা নিয়ে ব্রহ্মদেশের সেই সংগ্রামক্ষেত্র ছেড়ে আজ আমাকে বিদায় নিতে হচ্ছে। ইম্ফলে ও ব্রহ্মদেশে আমাদের মুক্তি সংগ্রামের প্রথম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। কিন্তু এ মাত্র সূচনা -বারবার আমাদের সে চেষ্টায় ব্রতী হতে হবে। চিরদিন আমি আশা পোষণ করে এসেছি,—তাই পরাজয় বরণ করে নিতে পারব না। ইম্ফলের সমতলক্ষেত্রে—আরাকানের জঙ্গল আর ব্রহ্মদেশে আপনারা শত্রুর বিপক্ষে সংগ্রাম করেছেন। আপনাদের মুক্তি সংগ্রামের এ বীরত্ব কাহিনী চিরদিনের জন্য ইতিহাসের পাতায় লেখা হয়ে থাকবে। ইনক্লাব জিন্দাবাদ—আজাদ হিন্দ ফৌজ জিন্দাবাদ--জয় হিন্দ।

স্বাঃ—সুভাষচন্দ্র বসু, আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক, ২১শে এপ্রিল ১৯৪৫

৬

আজাদী ফৌজের সমর সঙ্গীত

কদম কদম বাড়ায়ে যায়
খুসীকে গীত গায়ে যায়।
এ জিন্দগী হ্যায় কোম কী
(তো:) কোম পে লুটায়ে যায়।
তু শেরে হিন্দ আগে বাড়
মরণেসে ফিরভি তু ণ ডর
আসমান তক উঠাকে শর
জোসে বতন্ বাড়ায়ে যায়।
তেরে হিম্মৎ বাড়তি রহে
খুদা তেরী শুনতা রহে
যো সামনে তেরে চড়ে
তো খাক্‌মে মিলায়ে যায়।
চলো দিল্লী পুকারকে
কোমী নিশান সাম্‌হালকে
লাল কিল্লে গাড়কে
লহরায়ে যা লহরায়ে যা॥

৭

আজাদী বাহিনীর সঙ্কল্পবাণী

সৈন্যদিগকে এক আবেদন পত্রে কতকগুলি জ্ঞাতব্য বিষয় লিখিতে হয় যথা পূর্ব্ব এশিয়ার বাসস্থান, ভারতে বাসস্থান, বয়স, শিক্ষা, বিবাহিত কিনা; তাহারা নিম্নলিখিত সংকল্প বাক্যও সহি করিত।

"আমি স্বেচ্ছায় আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান ও এর সৈন্য শ্রেণী ভুক্ত হচ্ছি। আমি সম্পূর্ণ নিষ্ঠার সঙ্গে স্বাধীনতার জন্য জীবনপণ করছি। আমি সর্বপ্রকারে এমন কি জীবন পণেও ভারতের সেবা করব এবং স্বাধীনতা অন্দোলনে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করব। নিজেকে দেশ সেবায় উৎসর্গ করে কখনো ব্যক্তিগত স্বার্থ কামনা করবনা। প্রত্যেক ভারতীয়কে আমি ভ্রাতা বা ভগ্নী বলে মনে করি। ধর্ম, ভাষা বা ভৌগোলিক সংস্থানকে আমি কখনো প্রাধান্য দিব না। আমি বিশ্বস্তভাবে এবং দ্বিধাশূন্যচিত্তে সঙ্ঘের সমস্ত ন্যায়সঙ্গত হুকুম মানিয়া চলিব।"

৮

তিরঙা ঝাণ্ডা

[আজাদ-হিন্দ ফৌজের জাতীয় পতাকা-গীত]

কৌমী তিরংগে ঝণ্ডে উঁচে রহে জহাঁমে
হো তেরী সিং বুলন্দী জৈসা চাঁদ আসমানে
তু জিতকা নিশাঁ হো তু জান হৈ হমারী !
হরএক বশরকী লব পৈ জারী হৈ এ দুয়ায়ে
কৌমী তিরংগা ঝণ্ডা হম্ শৌকসে উড়ায়ে ।
আকাশ ও জমীঁ পর হো তেরা বোলবোলা,
ঝুক্ জায় তেরে আগে হর তাজ তখতওয়ালা ।
হর কৌমকী নজরমে হৈ নিশাঁ অমনকা
হো এসা মুঅস্সর তো, সারা তেরা জঁহা হো ।
'মুস্তাক ওয়ে নবাব' এ খুশ হোকে গা রহা হৈ ।
শিরপর তিরংগা ঝণ্ডা জলওয়া দিখা রহা হৈ ।
কৌমী তিরংগা ঝণ্ডা উঁচা রহে জহাঁমে

— — —

নেতাজীর বাণী

[পত্রাবলীর মর্ম্মাংশ]

ক

চরিত্র গঠন ও মানসিক উন্নতি

[নেতাজী নিজে পূতচরিত্রের লোক। তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছিলেন যে, কর্ম্মীগণ চরিত্রবান খাঁটি মানুষ না হলে দেশ কখনও স্বাধীন হবে না। মেকি স্বার্থপর, দুর্ব্বলচিত্ত মানুষ দ্বারা দেশোদ্ধার হয় না। তাই তিনি যুবকদের ও কর্ম্মীদের চরিত্র গঠনের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। চরিত্র গঠন বিষয়ে মান্দালয় জেল হইতে একজন কর্ম্মীকে লিখিত পত্রাবলীর কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হইল। যুবকগণের চরিত্র গঠনে এই বাণীর বিশেষ উপকারিতা আছে।]

১

......"শুধু কাজের দ্বারা মানুষের আত্মবিকাশ সম্ভবপর নয়। কাজের মধ্য দিয়া যেমন বাহিরের উশৃঙ্খলতা নষ্ট হইয়া যায় লেখাপড়া ও ধ্যান ধারণার দ্বারা internal discipline বা ভিতরের সংযম প্রতিষ্ঠিত হয়। নিয়মিত ব্যায়াম করিলে শরীরের উন্নতি হয় এবং নিয়মিত সাধনা করিলে সদ্‌বৃত্তির অনুশীলন ও রিপুর ধ্বংস হইয়া থাকে। সাধনার উদ্দেশ্য দুইটি—(১) **রিপুর ধ্বংস এবং প্রধানতঃ কাম, ভয় ও স্বার্থপরতা জয় করা ; (২) ভালবাসা, প্রেম, ভক্তি, ত্যাগ, বুদ্ধি প্রভৃতি গুণের বিকাশ সাধন করা।**

কাম জয়ের প্রধান উপায় সকল স্ত্রীলোকের মধ্যে মাতৃরূপ দেখা ও মাতৃভাব আরোপ করা এবং স্ত্রীমূর্ত্তিতে (যেমন দুর্গা কালী) ভগবানের চিন্তা করা। স্ত্রীমূর্ত্তিতে ভগবানকে বা গুরুর চিন্তা করিলে মানুষ ক্রমশঃ সকল স্ত্রীলোকের মধ্যে ভগবানকে দেখিতে শিখে; সে অবস্থায় পৌঁছিলে মানুষ নিষ্কাম হইয়া যায়। ব্যবহারিক জীবনে **সকল স্ত্রীলোককে "মা" বলিয়া ভাবিতে ভাবিতে** মন ক্রমশঃ পবিত্র ও শুদ্ধ হয়।

ভক্তি ও প্রেমের দ্বারা মানুষ নিঃস্বার্থ হইয়া পড়ে। মানুষের মন ব্যক্তি বা আদর্শের প্রতি যেমন ভালবাসা বা ভক্তি বাড়ে তেমন স্বার্থপরতাও কমে।·····ভালবাসিতে বাসিতে মনটি ক্রমশঃ সংকীর্ণতা ছাড়াইয়া বিশ্বের মধ্যে লীন হইতে পারে। ·····মানুষ যাহা চিন্তা করে ঠিক সেইরূপ সে হইয়া পড়ে। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"॥ নিজেকে "দুর্ব্বল ও পাপী" ভাবিলে মানুষ দুর্ব্বল ও ও পাপী এবং "শক্তিমান ও পবিত্র" ভাবিলে মানুষ শক্তিমান ও পবিত্র হইয়া উঠে।

ভয় জয় করার উপায় শক্তিসাধনা। দুর্গা, কালী প্রভৃতি মূর্ত্তি শক্তির রূপ বিশেষ। ইহাদের নিকট শক্তি প্রার্থনা করিলে এবং তাঁহাদের চরণে মনের দুর্ব্বলতা ও মলিনতা বলিস্বরূপ প্রদান করিলে মানুষ শক্তিলাভ করে। **আমাদের মধ্যে অনন্ত শক্তি নিহিত আছে সেই শক্তির বোধন করিতে হইবে।** পূজার উদ্দেশ্য মনের শক্তির বোধন করা। প্রত্যহ পঞ্চেন্দ্রিয় ও সকল রিপুকে তাঁহার চরণে নিবেদন করিবে। পঞ্চপ্রদীপ অর্থ পঞ্চেন্দ্রিয়। ······**বলির অর্থ রিপু বলি**—কারণ ছাগই কামের রূপবিশেষ। সাধনার কাজ একদিকে রিপু ধ্বংস করা, অপরদিকে সদ্‌বৃত্তির অনুশীলন

করা। **রিপুর ধ্বংস হইলেই দিব্যভাবের দ্বারা হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিবে।** আর দিব্যভাব হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিলেই সকল দুর্ব্বলতা পলায়ন করে। **প্রত্যহ দুইবেলা ধ্যান করিবে।** কিছুদিন ধ্যান করার সঙ্গে সঙ্গে শক্তি পাইবে, শান্তিও হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিবে।

২

স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য প্রত্যহ কিছু ব্যায়াম চর্চ্চা করিবে। Muller এর "My System" যোগাড় করে এই ব্যায়াম কর। আমি নিজে Muller এর systemএ ব্যায়াম করে থাকি এবং উপকারও পেয়েছি। ছাত্রসমাজে মূলারের ব্যায়ামের বেশী প্রচলন করিলে খুব উপকার হয়।

মানুষের দৈনন্দিন কাজকর্ম্মের যে উদ্দেশ্য বা আদর্শ অর্থাৎ **আত্মবিকাশ সাধন** সে কথা ভুলিলে চলিবে না। কাজই চরম উদ্দেশ্য নয়; **কাজের ভিতর দিয়ে চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে হবে** এবং জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ সাধন করিতে হবে। মানুষকে ব্যক্তিত্ব ও প্রবৃত্তি অনুসারে বৈশিষ্ট লাভ করিতে হবে এবং এই বৈশিষ্টের মূলে একটি সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ চাই। যে ব্যক্তির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হয় নাই তার অন্তরে সুখ নাই। সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য চাই:—(১) ব্যায়াম চর্চ্চা (২) নিয়মিত পাঠ (৩) দৈনিক চিন্তা বা ধ্যান।·········**নিয়মিত ভাবে প্রত্যহ পনর মিনিট করে নির্জ্জনে চিন্তা বা ধ্যান করিবে, একঘণ্টা সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করিবে।** প্রত্যেককে নিজের সুবিধা অনুসারে এই সময় করে নিতে হবে।' বইগুলির নাম দিচ্ছি:—

[ক]

ধর্ম্মসম্বন্ধীয়

(১) 'শ্রীশ্রীকথামৃত' (২) 'ব্রহ্মচর্য্য'—সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য, (ঐ) রমেশ চক্রবর্ত্তী, ঐ ফকির চন্দ্র দে, (৩) 'স্বামীশিষ্য-সংবাদ' (৪) 'পত্রাবলী'—বিবেকানন্দ, (৫) 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'—বিবেকানন্দ, (৬) 'বক্তৃতাবলী'—বিবেকানন্দ, (৭) 'ভাববার কথা'—বিবেকানন্দ, (৮) 'ভারতের সাধনা' —স্বামী প্রজ্ঞানন্দ, (৯) 'চিকাগো বক্তৃতা'—স্বামী বিবেকানন্দ।

[খ]

সাহিত্য, কবিতা, ইতিহাস প্রভৃতি

(১) "দেশবন্ধু গ্রন্থাবলী" (২) 'বাঙ্গলার রূপ'—গিরিজা শঙ্কর রায় চৌধুরী (৩) বঙ্কিম গ্রন্থাবলী (৪) নবীন সেনের 'কুরুক্ষেত্র', 'প্রভাস', 'রৈবতক', 'পলাশীযুদ্ধ', (৫) রবীঠাকুরের 'কথা ও কাহিনী' 'গীতাঞ্জলী', 'চয়নিকা', 'ঘরে বাহিরে' 'গোরা' ; (৬) ভূদেব বাবুর 'সামাজিক প্রবন্ধ', 'পারিবারিক প্রবন্ধ' (৭) ডি, এল, রায়ের 'দুর্গাদাস', 'মেবার পতন', 'রাণাপ্রতাপ' (৮) 'ছত্রপতি শিবাজি' সত্য চরণ শাস্ত্রী, (৯) শিখের বলিদান (১০) রাজনারায়ণ বসুর 'সেকাল একাল' (১১) 'রাজস্থান' (১২) 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' (১৩) 'নব্য জাপান (১৪) 'নির্ব্বাসিতের আত্মকথা'।

২৷

অন্তরে শান্তি ও বন্দীজীবনের মূল্য

জীবনে ষোল আনা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত না হইলে মেরুদণ্ড ঠিক রাখা মুস্কিল। জীবন প্রভাতে এই প্রার্থনা বুকে লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে

অবতীর্ণ হই "তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি"। এখন পর্য্যন্ত ভগবান সে প্রার্থনা সফল করিয়াছেন। তাই আমি বড় সুখী—সময়ে সময়ে মনে হয় আমার মত সুখী জগতে কয়জন আছে! এখন এই বৃত্তাকার উন্নত প্রাচীরের বাহিরে যাইবার আশা যে পরিমাণে সুদূর পরাহত হইতেছে সেই পরিমাণে আমার চিত্ত শান্ত ও উদ্বেগ শূন্য হইয়া আসিতেছে। অন্তরের মধ্যে বাস করা ও অন্তরের আত্মবিকাশের স্রোতে জীবনতরী ভাসাইয়া দেওয়ার মধ্যে পরম শান্তি আছে এবং **বেশী দিন রুদ্ধ অবস্থায় বাস করিতে হইলে অন্তরের শান্তিই একমাত্র সম্বল**—তাই সুদীর্ঘ কারাবাসের সম্ভাবনায় আমি এক অপূর্ব্ব শান্তি পাইতেছি।

Emerson বলিয়াছেন "We must live from within"

যে মাপকাঠির দ্বারা আমাদের (বন্দীদের) বিচার করিতে হইবে তাহা অন্তরের বাহিরের নয়। কারণ বাহিরের মাপকাঠিতে আমাদের জীবনের মূল্য শূন্যবৎ। এইখানে যদি জীবনে যবনিকা পতন হয় তবে বাস্তব সংসারের উপর আমাদের জীবনের স্থায়ী ছাপ নাও থাকিতে পারে। কিন্তু জীবনে যদি আদর্শকে বাস্তবের ভিতর দিয়া ফুটাইয়া তুলিবার সুযোগ না পাই তাহা হইলেও আমার জীবন ব্যর্থ হইবে না। মহান আদর্শ যদি প্রাণের মধ্যে গ্রহণ করিয়া থাকি—কায়মন যদি সেই মহান আদর্শের সুরে বাঁধিয়া থাকি আদর্শের সহিত যদি নিজের অস্তিত্ব মিশিয়া থাকে—তাহা হইলে আমি সন্তুষ্ট। আমার জীবন জগতের কাছে ব্যর্থ হইলেও আমার (এবং বোধ হয় ভাগ্য বিধাতার) কাছে ব্যর্থ নয়। **জগতে সব কিছুই ক্ষণভঙ্গুর শুধু একটা বস্তু ভাঙ্গে না বা নষ্ট হয় না। আমাদের আদর্শ অবিনশ্বর।** ভাবকে কি প্রাচীরের

দ্বারা ঘিরিয়া রাখিতে পারে ?……**ত্যাগ ও উপলব্ধি** renunciation and realisation **একই বস্তুর এপিঠ ওপিঠ।**

গ
জেল ও কয়েদী

(মান্দালয় হইতে দিলীপ রায়কে লিখিত)

কোন ভদ্র বা সুশিক্ষিত ব্যক্তি কারাবাস পছন্দ করতেই পারে না। জেলখানার সমস্ত আবহাওয়া মানুষকে যেন বিকৃত ও অমানুষ করে তোলারই উপযোগী এবং আমার বিশ্বাস এ কথাটা সকল জেলের পক্ষেই খাটে। আমার মনে হয় অপরাধীদের অধিকাংশেরই কারাবাসকালে নৈতিক উন্নতি হয় না, বরং তারা যেন আরো হীন হয়ে পড়ে। মানুষ যদি তার নিজের অন্তরে ভেবে দেখবার মত যথেষ্ট বিষয় খুঁজে পায়, বন্দী হলেও তার কষ্ট নাই, অবশ্য যদি তার স্বাস্থ্য অটুট থাকে।… লোকমান্য তিলক কারাবাসকালে গীতার সমালোচনা লেখেন, মান্দালয় জেলে ছ'বছর বন্দী হয়ে থাকাটাই তাঁর অকালমৃত্যুর কারণ।…জেলের মধ্যে যে নির্জনতায় মানুষকে বাধ্য হয়ে দিন কাটাতে হয় সে নির্জনতাই তাকে জীবনের চরম সমস্যাগুলি তলিয়ে বুঝবার সুযোগ দেয়। অন্য কারণে না হলেও শুধু এই জন্যই আমার মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে অনেকখানি লাভবান হতে পারবো।

ঘ

দলাদলি ও বাঙ্গলার ভবিষ্যৎ

[মান্দালয় জেল হইতে]

আজ বাঙ্গলার সর্বত্রই দলাদলি এবং ঝগড়া, যেখানে কাজকর্ম যত কম সেখানে ঝগড়া তত বেশী। শুধু এই কথা ভাবি ঝগড়া করিবার জন্য এত লোক পাওয়া যায় কিন্তু মিলাইতে পারে এরকম একজন লোকও কি আজ সারা বাঙ্গলার মধ্যে পাওয়া যায় না! এই দলাদলির জন্য বাংলা আজ শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায়ের মত সেবক হারাইয়াছে। আরও কয়জনকে হারাইবে তাহা কে বলিতে পারে? বাঙ্গালী আজ অন্ধ কলহে বিষাদে নিমগ্ন, তাই একথা বুঝিয়াও বুঝিতেছে না, নিঃস্বার্থ আত্মদানের কথা কোথাও শুনিতে পাই না।... অত বড় একটা প্রাণ (দেশবন্ধু) নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়া মহাশূন্যে মিলাইয়া গেল। আগুনের ঝলকার মত ত্যাগ-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বাঙ্গালীর সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিল। সেই দিব্য আলোকের প্রভাবে বাঙ্গালী ক্ষণেকের জন্য স্বর্গের পরিচয় পাইল। কিন্তু আলোকও নিবিল, বাঙ্গালী পুরাতন স্বার্থের গণ্ডীতে আশ্রয় লইল।...আজ বাঙ্গলার সর্বত্র কেবল ক্ষমতার জন্য কড়াকড়ি চলিতেছে। যার ক্ষমতা আছে সে ক্ষমতা বজায় রাখিতেই ব্যস্ত; যার ক্ষমতা নাই সে ক্ষমতা কাড়িবার জন্য বদ্ধপরিকর। এই ক্ষমতালোলুপ রাজনীতিকবৃন্দের ঝগড়া বিবাদ ছাড়িয়া নীরবে আত্মোৎসর্গ করিয়া যাইতে পারে; এমন কর্ম্মী কি বাঙ্গলায় আজ নাই? সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা যদি চলে

তবে বাঙ্গলার বহু নিঃস্বার্থ কর্ম্মীকে ক্রমে ক্রমে অনিলবরণের পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে।.........আজ বাংলার অনেক কর্ম্মীর মধ্যে ব্যবসাদারী পাটোয়ারী বুদ্ধি বেশ জাগিয়া উঠিয়াছে। আমি তো জানিতাম সেবার আদর্শ এই।—

"দাও দাও ফিরে নাহি চাও,
থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল"।

দুঃখের কথা, কলঙ্কের কথা, ভাবিতে গেলে বুক ফাটিয়া যায়, প্রতিকারের উপায় নাই, করিবার ক্ষমতা নাই, তাই অনেক সময়ে ভাবি চিঠিপত্র লেখা বন্ধ করিয়া বাহ্যজগতের সহিত সকল সম্বন্ধ শেষ করিয়া দিই। পারি তো দেশবাসীর পক্ষ হইতে আমরা লোকচক্ষুর অন্তরালে তিলে তিলে জীবন দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়া যাইব।

আজ প্রায় ১২।১৪ বৎসর ধরিয়া যে গভীর বেদনা তুষানলের মত আমাকে দগ্ধ করিতেছে তাহা দূর করিবার জন্য আমি এই কার্য্যে (সেবাগ্রামের কার্য্যে) হস্তক্ষেপ করিয়াছি। আমি কংগ্রেসের কাজ ছাড়িতে পারি—তবুও সেবাগ্রামের কাজ ছাড়া আমার পক্ষে অসম্ভব। "দরিদ্রনারায়ণের" সেবার এমন প্রকৃষ্ট সুযোগ আমি কোথায় পাইব?

———

৬

জীবনের লক্ষ্য

[মান্দালয় জেল হইতে শরৎ বাবুকে লিখিত পত্র]

জীবন সংগ্রামের মূলে রহিয়াছে মতবাদের সংঘর্ষ—সত্য এবং মিথ্যা ধারণার সংঘর্ষ। কেহ কেহ ইহাকে সত্যের বিভিন্ন স্তর বলিয়া থাকেন। মানুষের ধারণাই মানুষকে চালিত করিয়া থাকে। এই সমস্ত ধারণা নিষ্ক্রিয় নহে, ক্রিয়াশীল ও সংঘর্ষাত্মক। হেগেলের Absolute Idea, হপম্যান ও সোপেনহারের Blind Will এবং হেনরি বার্গসঁর Iean Vital এর মতই এই সমস্ত ধারণা ক্রিয়াশীল। এই সমস্ত ধারণা নিজেদের পথ নিজেরা সৃষ্টি করিয়া লইবে। আমরা ত মাটির পুতুলমাত্র। ভগবানের তেজরাশির কয়েকটি স্ফুলিঙ্গমাত্র আমাদের মধ্যে নিবদ্ধ। আমাদিগকে এই ধারণার মধ্যে আত্মোৎসর্গ করিতে হইবে।

... ...

ঐহিক এবং জড়দেহের সুখদুঃখকে অগ্রাহ্য করিয়া যে এইভাবে আত্মনিবেদন করিতে পারে জীবনে তাহার সফলতা অবশ্যম্ভাবী। আমার আদর্শ যে একদিন জয়ী হইবে, সে সম্বন্ধে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে। সুতরাং আমার স্বাস্থ্য এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন চিন্তাই আমি করি না। ...আমি দোকানদার নহি, দর কষাকষি আমি করি না। কূটচালের পিচ্ছিল পথ আমি ঘৃণা করি। আমি একটা আদর্শ ধরিয়া দণ্ডায়মান। ব্যস্ এইখানেই শেষ। আমি জীবনকে এতটা প্রিয় মনে করি না যে, তাহা রক্ষার জন্য চালাকির আশ্রয় লইব। জীবনের মূল্য সম্বন্ধে আমার ধারণা বাজারের ধারণা

অপেক্ষা স্বতন্ত্র। শারীরিক ও বৈষয়িক সুখের নিরিখে জীবনের সাফল্য ও ব্যর্থতা নির্ণয় করা যায় বলিয়া আমি মনে করি না। আমাদের সংগ্রাম দৈহিক শক্তির নহে। বৈষয়িক লাভও আমাদের সংগ্রামের উদ্দেশ্য নহে।

স্বাধীনতা এবং সত্য আমাদের আদর্শ। আমাদের শরীর নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু অটল বিশ্বাস এবং দুর্জ্জয় সঙ্কল্পের বলে আমাদের জয় অবশ্যম্ভাবী। আমাদের চেষ্টার সফল পরিণতি দেখিবার মত সৌভাগ্য কাহার হইবে একমাত্র ভগবানই তাহার বিধানকর্ত্তা। আমার সম্বন্ধে আমি বলিতে পারি যে আমি আমার কাজ করিয়া যাইব তাহার পর যাহা হয় হইবে।

ঈশ্বর মহান্ অন্ততঃ তাঁহার সৃষ্ট পদার্থ অপেক্ষা মহান্। আমরা তাঁহার উপর যখন বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি তখন আমাদের দুঃখ করিবার কারণ থাকিতে পারে না।

চ
উত্তর কলিকাতা অধিবাসীগণের নিকট নিবেদন

[মান্দালয় জেল হইতে ১৯২৭ সালের নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে লিখিত]

আমার অপরাধ সম্বন্ধে আমি বলিতে পারি যে, অপরাধ যদি কিছু করিয়া থাকি তাহা এই যে, পরাধীন জাতির সনাতন গতানুগতিক জীবনপন্থা ছাড়িয়া কংগ্রেসের একজন দীন সেবক হিসাবে স্বদেশ-সেবায় মন-প্রাণ-শরীর সমর্পণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। তারপর আমি যে শুধু কারারুদ্ধ হইয়াছি তাহা নয়। বিশ মাস

হইল আমি দেশান্তরিত। বাঙ্গলার মাটি, বাঙ্গলার জলের পবিত্র স্পর্শ হইতে কতকাল যাবৎ আমি বঞ্চিত! তবে আমার সান্ত্বনা ও সৌভাগ্য এই যে আমার কারাবাস ব্যর্থ হয় নাই। আজ "আমার সকল ব্যথা রঙ্গিন হয়ে গোলাপ হয়ে" ফুটিয়াছে। এইখানে আসিবার পূর্ব্বে আমি বাংলাকে ভারতভূমিকে ভালবাসিতাম। কিন্তু এই বিচ্ছেদের দরুণ সোনার বাংলাকে পুণ্য ভারতভূমিকে শতগুণে ভালবাসিতে শিখিয়াছি। বাঙ্গলার আকাশ, বাংলার বাতাস—"স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে যে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা" বাঙ্গলার মোহিনী রূপ আজ আমার নিকট কত পবিত্র কত সুন্দর হইয়াছে। যে আত্যন্তিক আত্মোৎসর্গের আদর্শ লইয়া আমি কর্ম্মভূমিতে প্রবেশ করিয়াছিলাম। নির্ব্বাসনের পরশমণি আমায় দিন দিন সে মহাদানের যোগ্য করিয়া তুলিয়াছে। যে চিরন্তন সত্য বাংলার ভাগীরথী ও বাংলার ঢেউ-খেলানো শ্যামল শস্যক্ষেত্রে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে, বাঙ্গলার যে প্রাণ-ধর্ম্মকে বঙ্কিম হইতে আরম্ভ করিয়া দেশবন্ধু পর্য্যন্ত প্রতিভাবান্ মনীষিগণ সাধনার দ্বারা উপলব্ধি করিয়া সাহিত্যের মধ্যে প্রকট করিয়াছিলেন, বাঙ্গলার যে বিচিত্র রূপ কত শিল্পী, কবি সাহিত্যিকের লেখনী ও তুলিকার বিষয় হইয়াছে, আজ তাহার আভাস পাইয়া ধন্য হইয়াছি। এই অনুভূতির পুণ্য প্রভাবে আমার দুই বৎসর কারাবাস সার্থক হইয়াছে। আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে এ হেন মায়ের জন্য দুঃখ ও বিপদ বরণ করা কত গৌরবের কত সৌভাগ্যের কথা।

নিজের জীবন পূর্ণরূপে বিকশিত করিয়া ভারতমাতার পদাম্বুজে অঞ্জলি স্বরূপ নিবেদন করিব এবং এই আন্তরিক উৎসর্গের ভিতর

দিয়া পূর্ণতর জীবন লাভ করিব—এই আদর্শের দ্বারা আমি অনুপ্রাণিত হইয়াছিলাম। স্বদেশ সেবা বা রাজনীতির পর্য্যালোচনা আমি সাময়িক বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করি নাই। এইজন্য পরাধীন দেশে স্বদেশ সেবকের জীবনে যে বিপদ ও পরীক্ষা, দুঃখ ও বেদনা অবশ্যম্ভাবী, তার জন্য কায়মনে প্রস্তুত হইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। আমার এই ক্ষুদ্র অথচ ঘটনাবহুল জীবনে যে সব ঝড় আমার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে বিঘ্ন বিপদের সেই কষ্টিপাথর দ্বারা আমি নিজেকে সূক্ষ্মভাবে চিনিবার ও বুঝিবার সুযোগ পাইয়াছি। অজানা ভবিষ্যৎকে সম্মুখে রাখিয়া যে ব্রত একদিন গ্রহণ করিয়াছিলাম তাহা উদ্‌যাপন না করিয়া বিরত হইব না। আমার সমস্ত প্রাণ ও সারা জীবনের শিক্ষা নিঙাড়িয়া আমি এই সত্য পাইয়াছি—পরাধীন জাতের সব ব্যর্থ,—শিক্ষা দীক্ষা কর্ম্ম—সব ব্যর্থ—যদি তাহা স্বাধীনতালাভের সহায় ও অনুকূল না হয়। তাই আজ আমার হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ হইতে এই বাণী নিরন্তর আমার কাণে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে, "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়রে কে বাঁচিতে চায় ?"

আত্মোৎসর্গের পবিত্র ও জীবন্ত বিগ্রহ প্রাতঃস্মরণীয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের চরণে দেশ সেবায় আমার প্রথম শিক্ষা দীক্ষা। তাঁহার জীবদ্দশায় সকল বিপদ তুচ্ছ করিয়া তাঁহার পতাকা অনুসরণ করিয়াছি। তাহার অবর্ত্তমানে তাঁহার লোকোত্তর চরিত্রের শিক্ষা হৃদয়ে ধারণ করিয়া ও তাঁহার মহিমাময় জীবনের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া একনিষ্ঠভাবে জীবনের পথে চলিব, এই সঙ্কল্প মনের মধ্যে পোষণ করি ! সর্ব্ব মঙ্গলময় ভগবান আমার সহায় হউন।

সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতার সারমর্ম

মাতৃজাতির প্রতি সম্মান

হিন্দুজাতি গর্ব্ব করিয়া থাকে যে তাঁহারা মাতৃমূর্ত্তির ভিতর দিয়া ভগবানের আরাধনা করিয়া থাকে এবং তাঁহারা বাল-গোপাল রূপের মধ্যে ভগবানকে পাইয়াছে। কিন্তু আমি হিন্দুজাতিকে জিজ্ঞাসা করি—একবার বুকে হাত দিয়া বলুন—"আমাদের সমাজে বর্ত্তমান সময়ে ঘরে এবং বাহিরে আমরা মাতৃজাতির সম্মান রক্ষা করিতে পারিতেছি কিনা এবং আমাদের সমাজে বালক ও যুবকেরা মনুষ্যোচিত ব্যবহার পায় কিনা ?"

আজ যদি বাঙ্গলা দেশে পুরুষ থাকিত তাহা হইলে মাতৃজাতির অসম্মান দেখিয়া তাহারা ক্ষিপ্ত প্রায় হইত এবং বীরশ্রেষ্ঠ খড়্গ বাহাদুর সিংহের মত প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া মাতৃজাতির সম্মান রক্ষার্থে কর্ম্ম সমুদ্রে ঝাঁপ দিত।

ইংরাজকে তোমরা হয়ত ঘৃণা করিয়া থাক কিন্তু আমি বলি, ইংরাজ যেরূপ তাহার মাতৃজাতিকে সম্মান করিতে জানে সেইরূপ সম্মান করিতে ইংরাজের নিকট শিক্ষা কর। একজন ইংরাজ মহিলার উপর অত্যাচার হইলে সমস্ত ইংরাজ জাতি পাগলের মত হইয়া যায় এবং সমস্ত জাতি সেই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়। ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রদেশে মিস্ এলিস নামক ইংরাজ রমণীর পাঠান কর্ত্তৃক অপহরণের ঘটনা হয়ত আপনাদের স্মরণ আছে।

'আমরা মুখে বলি "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

কিন্তু সমস্ত প্রাণ দিয়া কি আমরা জননী ও জন্মভূমিকে ভালবাসি? জননীকে ভালবাসার অর্থ শুধু নিজের প্রসূতিকে ভালবাসা নয়। সমস্ত মাতৃজাতিকে ভালবাসা। বাঙ্গলা দেশ—বাঙ্গলার জল, বাঙ্গলার মাটি, বাঙ্গলার আকাশ, বাঙ্গলার বাতাস, বাঙ্গলার শিক্ষাদীক্ষা ও প্রাণধর্ম্ম বাঙ্গলার নরীজাতির মধ্যে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। **যে ব্যক্তি বাঙ্গলার মাতৃজাতিকে শ্রদ্ধা করিতে জানে না সে বাঙ্গলা দেশকে কি করিয়া শ্রদ্ধা করিবে?** যে ব্যক্তি বাঙ্গলা দেশকে অন্তরের সঙ্গে শ্রদ্ধা করে না—ভালবাসে না—সে কি করিয়া মানুষ হইবে?

জীবনে যাহা কিছু পবিত্র যাহা কিছু সুন্দর যাহা কিছু কল্যাণকর সে সবের সমাবেশ আমরা করিয়া থাকি দেশ মাতৃকার অপরূপ রূপের মধ্যে এবং ত্রিলোকজয়ী ভুবনমনোমহিণী মাতৃমূর্ত্তিতে। অতএব হে ভ্রাতৃমণ্ডলী, মায়ের আরাধনা করিতে শিখ, **মাতৃজাতিকে ভক্তি কর, শ্রদ্ধা কর।** নিজের দেশে মাতৃজাতির সম্মান অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য কৃত সঙ্কল্প হও।

মনে রাখিও সেই কথা যাহা বহুযুগ পূর্ব্বে মনু বলিয়াছিলেন :—

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে, রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥
শোচন্তি মাময়ো যত্র বিনশ্যত্যাশু তৎকুলং।
শাচন্তি তু ব'ত্রতা ববর্দ্ধতে তদ্ধি সর্ব্বদা॥"

যেখানে নারী পূজিতা হন তথায় দেবতারা আনন্দলাভ করিয়া থাকেন। যেখানে নারীর সম্মান নাই সে দেশে সমস্ত ক্রিয়া কাণ্ড একবারে বিফল। যে কুলে নারীরা শোক করিয়া থাকেন (বা উৎপীড়িতা হন) সে কুল অতি শীঘ্র বিনষ্ট হয় এবং যে

কুলে তাহাদের কোনও দুঃখ, কষ্ট, শোক নাই—সে কুলের শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে। যে যুগে এদেশের নারীর সম্মান অক্ষুণ্ণ ছিল সে যুগে মৈত্রেয়ী গার্গীর মত ঋষিপত্নী জন্মিয়াছিল, সে যুগে খনা লীলাবতীর মত বিদূষীর আবির্ভাব হইয়াছিল, অহল্যাবাই ও ঝান্সির রাণীর মত বীর রমণীর অভ্যুদয় হইয়াছিল। এ সোনার বাঙ্গলায়ও আমরা একদিন রাণী ভবানী ও দেবীচৌধুরাণীর মত রমণী দেখিয়াছিলাম। আমাদের মাতৃজাতিকে যদি শক্তিরূপিণী দেখিতে চাই তাহা হইলে বাল্য বিবাহ প্রথা উচ্ছেদ করিতে হইবে; স্ত্রীজাতিকে আজীবন ব্রহ্মচর্য্য পালনে অধিকার দিতে হইবে; উপযুক্ত স্ত্রীশিক্ষার আয়োজন করিতে হইবে, অবরোধপ্রথা দূর করিতে হইবে, বালিকাদের ও তরুণীদের স্বাস্থ্যরক্ষার নিমিত্ত ব্যায়াম শিক্ষার এবং আত্মরক্ষার নিমিত্ত লাঠি ও ছোরা খেলা শিক্ষার আয়োজন করিতে হইবে—এমন কি স্বাবলম্বী হইবার মত অর্থকরী শিক্ষাও দিতে হইবে, এবং বিধবাদের পুনর্ব্বিবাহের অনুমতি দিতে হইবে।

রাষ্ট্রীয় বিপ্লব করা বরং সহজ কিন্তু সামাজিক বিপ্লব বা সংস্কার সাধন করা তদপেক্ষা কঠিন, কারণ রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের সময়ে লড়াই করিতে হয় বাহিরের শত্রুর সঙ্গে। সমস্ত দেশবাসীর ভালবাসা ও সহানুভূতি লাঞ্ছিত সেবককে সঞ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত করে। সামাজিক বিপ্লবের সময় লড়াই করিতে হয় দেশবাসীর সঙ্গে, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে, আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে। নিজের ঘরে তাহাদিগকে দিবারাত্রি লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা সহিতে হয় এবং অখণ্ড সমাজের সহানুভূতি তাহারা কোনদিনও পায় না।

———

ছাত্রদিগের আদর্শ স্বাধীনতা

ছাত্রদিগের চক্ষের সম্মুখে এমন একটি নরসমাজের চিত্র ধরিতে হইবে, যাহাতে তাহারা ঐ আদর্শকে জীবনে বাস্তবে পরিণত করিতে চেষ্টা করে এবং এই সঙ্গে এমন একটি কর্ম্ম তালিকা তাহাদিগকে দিতে হইবে যাহাতে তাহারা যতদূর সম্ভব পালন করিবে। ছাত্রদের পক্ষে নির্ভীক ও আত্মনির্ভরশীল হইয়া চিন্তায় ও কর্ম্মে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।......একটা তিমির যুগ পার হইয়া ভারতীয় সভ্যতা আজ নব জীবনের পথে চলিয়াছে।......আবার নূতন করিয়া বাঁচিতে হইলে আমাদিগকে **চিন্তাজগতে একটা ভাববিপ্লব আনিতে হইবে** এবং জীবজগতে নররক্তের সংমিশ্র করিতে হইবে।......

ভাবজগতে বিপ্লব আনিতে হইলে আমাদিগকে এমন একটি আদর্শকে চোখের সম্মুখে আনিয়া ধরিতে হইবে যাহা বিদ্যুতের মত আমাদিগের শক্তিকে উন্মুখ করিয়া তুলিবে, **সে আদর্শ হইতেছে স্বাধীনতা**।......সমাজ ও ব্যক্তি, নর ও নারী, ধনী ও দরিদ্র সকলের জন্য স্বাধীনতা। ইহা শুধু রাষ্ট্রীয় বন্ধন মুক্তি নহে ইহা অর্থের সমান বিভাগ, জাতিভেদ ও সামাজিক অবিচারের নিরাকরণ ও সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা ও গোড়ামি বর্জ্জন সূচিত করে। এই আদর্শকে অবিবেচকরা হয়ত অসম্ভব বলিবে কিন্তু প্রাণের ক্ষুধাকে একমাত্র ইহাই শান্ত করিতে পারে।...... সত্যকার স্বাধীনতার অর্থ কেবলমাত্র ব্যক্তির জন্য নহে—সমগ্র সমাজের জন্যও সকল প্রকার বন্ধন হইতে মুক্তি। এ যুগের আদর্শ তাহাই—**সম্পূর্ণভাবে মুক্ত ভারতের ধ্যানমূর্ত্তি আমার হৃদয়কে অধিকার করিয়া রহিয়াছে।**

স্বাধীনতা অর্জ্জনের একমাত্র উপায় হইতেছে স্বাধীন ব্যক্তির ন্যায় চিন্তা ও অনুভব করা। **অন্তরে একটা পূর্ণ বিপ্লবের বন্যা বহিয়া যাউক** এবং **স্বাধীনতার মাদরা প্রবাহ আমাদের শিরায় শিরায় বহিয়া যাউক**। স্বাধীন হইবার ইচ্ছা যখন আমাদের মধ্যে জাগ্রত হইবে তখন কর্ম্মের একটা অশ্রান্ত প্রবাহ আমাদের হৃদয়ে স্থান পাইবে। ভীরুর সাবধান বাণী আমাদের নিবৃত্ত করিতে পারিবে না—সত্য ও কর্ম্মের আহ্বান আমাদিগকে তখন লক্ষ্যে পৌঁছিয়া দিবে।......

......জীবনের একটা মাত্র উদ্দেশ্য আছে তাহা হইতেছে **সকল প্রকার বন্ধন হইতে মুক্তি**। স্বাধীনতার জন্য উদগ্র আকাঙ্ক্ষাই হইতেছে জীবনের মূল সুর। নবোজাত শিশুর ক্রন্দন ধ্বনিই ত বন্ধনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঘোষণা।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবেই তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। রাত্রির পর দিন যেমন আসিবে তেমনি ইহাও আসিবে। ভারতবর্ষকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে এমন কোনও শক্তি পৃথিবীতে আজ নাই, কিন্তু আসুন, এমন মহীয়সী ভারতের ধ্যানচিত্র আজ আমরা গড়িয়া তুলি যাহার জন্য জীবন-সর্ব্বস্বধন বলি দিয়া আমরা ধন্য হইতে পারি। স্বাধীন ভারতবর্ষ তাহার মুক্তিবাণী জগতের দিকে দিকে ঘোষণা করুক।......জগতের সাধনা ও সভ্যতার প্রায় প্রতি রূপেই ভারতবর্ষের একটা নব অবদান দিবার আছে।

...সত্য, ন্যায় ও সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এই আদর্শকে আমরা এখনই ত্যাগ করিতে পারি না। অপর কেহ আমাদিগের সঙ্গে যদি যোগ না দেয় তবে আমাদিগকে একাই চলিতে হইবে। কিন্তু একথা নিশ্চিত যে, লক্ষ লক্ষ লোক এই স্বাধীনতার পথে

যাত্রায় যোগ দিবে। **বন্ধন, অন্যায় ও অসাম্যের সঙ্গে যুদ্ধের বিরতি হইতেই পারে না।** দেশের সকল স্বাধীনতাকামীরই সংঘবদ্ধ হইয়া স্বাধীনতার সৈনিকশ্রেণী গঠন করিবার সময় আসিয়াছে। ইহারা কেবল স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিবে না। স্বাধীনতার বাণী প্রচার করিবার জন্য দিকে দিকে প্রচারক প্রেরণ করিবে। আপনাদের মধ্য হইতে এই প্রচারক ও সৈন্যদলের সৃষ্টি করিতে হইবে। বিস্তৃত ও অন্তব্যাপী প্রচার ও দেশব্যাপী স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন আমাদের কর্ম্মতালিকার অন্তর্ভুক্ত হইবে। আমাদের প্রচারক চাষী ও কারখানার মজুরদের মধ্যে গিয়া নব বাণীর কথা প্রচার করিবে। তাহারা যুবকদের ও তাহাদের সমস্ত দিকে অনুপ্রাণিত করিবে। দেশের সমগ্র নারীজাতীকে উদ্বুদ্ধ করিবে—কারণ আজ নারীকে সমাজে ও রাষ্ট্রে পুরুষের সমান অধিকার লইয়া দাঁড়াইতে হইবে।...যদি আমরা শ্রমিক, চাষী, তথাকথিত নিম্নজাতি যুবকবৃন্দ, ছাত্রগণ ও নারীদিগকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে পারি তবে কংগ্রেস অসীম শক্তিমান্ হইয়া দেশের মুক্তি আনয়ন করিতে পারিবে।

স্বাধীনতার কোন সহজ নির্ব্বিঘ্ন পথ নাই। স্বাধীনতার পথে যেমন আঘাত বিপদ আছে তেমনি গৌরব ও অমরত্ব আছে। প্রাচীনের যাহা কিছু শৃঙ্খলের মত আমাদের চলাকে প্রতিপদে প্রতিহত করিয়া আসিতেছে আজ তাহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তীর্থযাত্রীর মত দলে দলে স্বাধীনতার লক্ষ্য পথে যাত্রা করিতে হইবে। স্বাধীনতাই জীবন, স্বাধীনতার সন্ধানে জীবন দানে অবিনশ্বর গৌরব।

তরুণের কাজ সৃষ্টি করা

আশা, উৎসাহ, ত্যাগ ও বীর্য্য লইয়া আমরা আসিয়াছি। আমরা সৃষ্টি করিতে আসিয়াছি, কারণ সৃষ্টির মধ্যেই আনন্দ। তনু, মন-প্রাণ বুদ্ধি ঢালিয়া দিয়া আমরা সৃষ্টি করিব। নিজের মধ্যে যাহা সত্য, যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু শিব আছে তাহা আমরা সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে ফুটাইয়া তুলিব। **আত্মদানের মধ্যে যে আনন্দ সে আনন্দে আমরা বিভোর হইব**। সেই আনন্দের আস্বাদ লইয়া পৃথিবীও ধন্য হইবে।

তরুণের ধর্ম্ম

তরুণদের একটা বিশিষ্ট ধর্ম্ম আছে; যাহা নূতন, যাহা সরস, যাহা অনাস্বাদিন—তাহারাই উপাসক আমরা। আমরা আনিয়া দিই পুরাতনের মধ্যে নূতনকে, জড়ের মধ্যে চঞ্চলকে, প্রবীণের মধ্যে নবীনকে এবং বন্ধনের মধ্যে অসীমকে, **আমরা অনন্তপথের যাত্রী** বটে কিন্তু আমরা অচেনা পথই ভালবাসি—অজানা ভবিষ্যতই আমাদিগের নিকট অত্যন্ত প্রিয়। আমরা চাই "right to make blunders"...এখানে আমাদের গর্ব্ব। **যৌবন সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে সৃষ্টিছাড়া ও লক্ষ্মীছাড়া**। অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার উন্মাদনায় আমরা ছুটিয়া চলি—বিজ্ঞের উপদেশ শুনিবার পর্য্যন্ত অবসর আমাদের নাই,

ভুল করি, ভ্রমে পড়ি, আছাড় খাই কিছুতেই আমরা উৎসাহ হারাই না, আমাদের তাণ্ডবলীলার অন্ত নাই—আমরা অবিরাম গতি।

এতদিন পরে আমরা তরুণরা নিজের শক্তি বুঝিয়াছি, নিজের ধর্ম্ম চিনিয়াছি। এখন আমাদের শাসন করে কে? তরুণের প্রসুপ্ত আত্মা যখন জাগরিত হইয়াছে তখন জীবনের মধ্যে সকল ক্ষেত্রে যৌবনের রক্তিমরাগ আবার দেখা দিবে।

জীবন বেদ বা আদর্শ

প্রত্যেক ব্যক্তির বা জাতির একটা ধর্ম্ম আদর্শ আছে; সেই আদর্শকে অবলম্বন ও আশ্রয় করিয়া সে গড়িয়া উঠে। সেই আদর্শকে সার্থক করাই তার জীবনের উদ্দেশ্য এবং সেই আদর্শকে বাদ দিলে তার জীবন অর্থহীন ও নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়ে।···**আদর্শ একটা প্রাণহীন গতিহীন বস্তু নয়, তার বেগ আছে, তার গতি আছে, প্রাণসঞ্চারিণী শক্তি আছে।**

বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য

বাঙ্গালীর আত্মবিশ্বাস আছে, বাঙ্গালীর ভাবপ্রবণতা ও কল্পনাশক্তি আছে তাই বাঙ্গালী বর্ত্তমান বাস্তব জীবনে সকল ত্রুটি, অক্ষমতা, অসাফল্যকে অগ্রাহ্য করে মহান্ আদর্শ কল্পনা করতে পারে। সেই

আদর্শের ধ্যানে ডুবে যেতে পারে এবং আপাত দৃষ্টিতে যাহা অসাধ্য তাহা সাধন করিবার চেষ্টা করতে পারে।

দেশের জন্য দুঃখভোগ

Sufferingএর মধ্যে বুঝি শুধু কষ্টই আছে কিন্তু এ কথা সত্য নয়। Suffering **এর মধ্যে কষ্ট যেমন আছে তেমন অপার আনন্দও আছে।** এই আনন্দবোধ যার হয়নি তার কাছে কষ্ট শুধু কষ্টই। সে ব্যক্তি দুঃখ কষ্টের নিষ্পেষণে অভিভূত হয়ে পড়ে কিন্তু যে ব্যক্তি দুঃখ কষ্টের ভিতর একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দের আস্বাদ পেয়েছে তার কাছে Suffering একটা গৌরবের জিনিষ। সে দুঃখকষ্টের চাপে মুমূর্ষু না হয়ে আরও শক্তিমান ও মহীয়ান হয়ে উঠে।……যে ব্যক্তি কোনও মহান আদর্শকে নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসার দরুণ দুঃখ যন্ত্রণা পায় তার কাছে দুঃখ ক্লেশ অর্থহীন নয়। দুঃখ তার কাছে রূপান্তরিত হয়ে আনন্দ বলে প্রতীয়মান হয় এবং সেই আনন্দ অমৃতের মত শিরায় শিরায় শক্তি সঞ্চার করে। আদর্শের চরণে যে আত্মসমর্পণ করলে পারে সেই কেবল জীবনের অর্থ বুঝতে পারে এবং জীবনের অন্তর্নিহিত রসের সন্ধান পায়।

………নীলকণ্ঠকে যে আদর্শ করে যে ব্যক্তি বলতে পারে আমার মধ্যে আনন্দের উৎস খুলে গেছে তাই আমি সংসারের সকল দুঃখ কষ্ট নিজের বুকের মধ্যে টেনে নিতে পারি যে ব্যক্তি বলতে পারে আমি সব যন্ত্রণা ক্লেশ মাথায় তুলে নিচ্ছি কারণ এর ভিতর দিয়ে আমি সত্যের সন্ধান পেয়েছি সে ব্যক্তিই সাধনায় সিদ্ধ হয়েছে।

———

যুব আন্দোলনের উৎপত্তি

বর্ত্তমান অবস্থা এবং বাস্তবের কঠিন বন্ধনের প্রতি প্রবল অসন্তোষ হইতে যুব আন্দোলনের উৎপত্তি। তরুণ প্রাণ কখনও বর্ত্তমানকে বাস্তবকে চরম সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে না। বিশেষতঃ যেখানে সে বর্ত্তমানের মধ্যে বাস্তবের মধ্যে অত্যাচার অবিচার বা অনাচার দেখিতে পায় সেখানে তার সমস্ত প্রাণ বিদ্রোহী হইয়া উঠে। সে ঐ অবস্থার একটা আমূল পরিবর্ত্তন করিতে সাহসী হয়। যুব আন্দোলনের উৎপত্তি প্রবল অসন্তোষ হইতে—ইহার উদ্দেশ্য ব্যক্তিকে, সমাজকে, রাষ্ট্রকে নূতন আদর্শে নূতনভাবে গড়িয়া তোলা। সুতরাং আদর্শবাদই যুব আন্দোলনের প্রাণ।

ব্যক্তিত্ব ও সমষ্টিগত সাধনা

সমাজ বা রাষ্ট্রের উন্নতি নির্ভর করে একদিকে ব্যক্তিত্বের বিকাশের উপর এবং অপরদিকে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার শক্তির উপর। আমাদের একদিকে খাঁটি মানুষ সৃষ্টি করিতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করিতে শিখিতে হইবে। সমগ্র সমাজের উন্নতি না হইলে একমাত্র ব্যক্তির উন্নতির দ্বারা বিশেষ ফল হয় না। এরূপ ব্যক্তিগত উন্নতির বেশী মূল্য থাকে না। সামাজিক জীবনে যে আদর্শের স্থান নাই সেই আদর্শের বেশী মূল্য নাই। ব্যক্তিত্ব ফুটাইবার জন্য যেরূপ গভীর সাধনা আবশ্যক, সামাজিক বৃত্তির বিকাশের জন্য সেরূপ সাধনার প্রয়োজন।

আমাদের সমাজে কতকগুলি anti-social (বা সমাজ গঠন বিরোধী) বৃত্তি প্রবেশ করিয়াছিল যাহার ফলে আমরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করিবার শক্তি ও অভ্যাস হারিয়েছিলাম, যেমন সন্ন্যাসের প্রতি আগ্রহ আমাদিগের মধ্যে সমাজের ও রাষ্ট্রের বন্ধন শিথিল করিল এবং সমাজ বা রাষ্ট্রের উন্নতি অপেক্ষা নিজের মোক্ষলাভ শ্রেয়স্কর বিবেচিত হইল।

আমার নিজের মনে হয় যে স্বার্থপরতা, পরশ্রীকাতরতা, উশৃঙ্খলতা প্রভৃতি সমাজ বিরোধী বৃত্তির জন্যই আমরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করিতে পারি না। ......আমাদের বর্ত্তমান পরাধীনতা ও সকল প্রকার দুর্দ্দশার মধ্যে যে কত মহাপুরুষ জন্মাইতেছেন তার একমাত্র কারণ যে খাঁটি মানুষ সৃষ্টির প্রচেষ্টা আমাদের জাতি কোনদিনই ভুলে নাই। কিন্তু আমরা ভুলিয়া গিয়াছিলাম Collective Sadhana বা সমষ্টিগত সাধনা। আমরা ভুলিয়া গিয়াছিলাম যে জাতিকে বাদ দিয়া যে সাধনা সে সাধনার কোন সার্থকতা নাই। তাই সমাজ গঠন-বিরোধী বৃত্তি আমাদের মানসক্ষেত্রে জন্মিয়াছে এবং ঐরূপ প্রতিষ্ঠান পরগাছার মত আমাদের জাতীয় জীবনকে ভারগ্রস্থ ও শক্তিহীন করিয়া তুলিয়াছে। আজ বাংলার তরুণ সমাজকে রুদ্রের মত বলিতে হইবে—জাতি-সমাজ-গঠন-বিরোধী বৃত্তি নিচয় আমরা কুসংস্কার জ্ঞানে বিষবৎ পরিত্যাগ করিব এবং জাতি-সমাজ-গঠনের প্রতিকূল সমস্ত প্রতিষ্ঠান আমরা একেবারে নির্ম্মূল করিব।

বর্ত্তমান যুগে যুগোপযোগী সাধনায় যদি প্রবৃত্ত হইতে হয় তবে **দেশাত্মবোধকেই জাতির আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।**

আত্মশক্তির স্ফুরণ

আমাদের অসীম শক্তি আছে—নাই আমাদের আত্ম-বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা। নিজের উপর, নিজের জাতির উপর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ফিরাইয়া আনিতে হইবে। দেশবাসীকে অন্তরের সঙ্গে ভালবাসিতে হইবে। মানুষ অন্তরের সহিত যাহা আকাঙ্ক্ষা করে তাহা একদিন পাইবেই পাইবে।

স্বাধীনতা লাভের জন্য আমরা যদি পাগল হইতে পারি তবেই আমাদের অন্তর্নিহিত অসীম শক্তির স্ফুরণ হইবে। আমরা নিজেরাই অবাক হইব এত শক্তি এতদিন কোথায় লুকাইয়া ছিল। এই নব জাগ্রত শক্তির বলে আমরা স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে পারিব। আমরা যতই স্বাধীনতার জন্য ব্যাকুল হইব ততই আমরা আনন্দের অনুভূতি পাইব। এই আনন্দের কাজ ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আমরা কেবল স্বাধীনতার কথাই চিন্তা করিব, স্বাধীনতার স্বাদই উপলব্ধি করিব, স্বাধীনতার কাহিনীই স্বপ্নে দেখিব।

জাতিকে যদি মুক্ত করিতে হয় তবে সর্ব্বাগ্রে স্বাধীনতার আস্বাদ নিজের অন্তরে পাইতে হইবে। "আমি মুক্ত, স্বাধীন মানুষ"—এই কথা ধ্যান করিতে করিতে মানুষ সত্য সত্যই নির্ভিক হয়ে উঠে। নির্ভিক হইতে পারিলে মানুষ কোনও বন্ধনে আবদ্ধ হয় না। কোনও বাধাবিঘ্ন তাহার পথরোধ করিতে পারে না।

সঙ্কল্প

"আমরা মানুষ হব; নির্ভীক মুক্ত খাঁটি মানুষ হব। নূতন স্বাধীন ভারত আমরা ত্যাগ, সাধনা ও প্রচেষ্টার বলে গড়ে তুলব। আমাদের ভারতমাতা আবার রাজ-রাজেশ্বরী হবেন; তাঁর গৌরবে আমরা গৌরবান্বিত হব। কোনও বাধা আমরা মানব না; কোনও ভয়ে আমরা ভীত হব না। আমরা নূতনের সন্ধানে অজানার পশ্চাতে চল্‌ব। জাতির উদ্ধারের দায়িত্ব আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে বিনয়ের সঙ্গে গ্রহণ করব। ঐ ব্রত উদ্‌যাপন করে আমরা আমাদের জীবন ধন্য করিব। ভারতবর্ষকে আবার বিশ্বের দরবারে সম্মানের আসনে বসাব। শ্রদ্ধাবনত মস্তকে গললগ্নীকৃতবাসে মাতৃচরণে সমবেত হইয়া করযোড়ে বলি—"পূজার সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ, অতএব জননি! জাগৃহি।"

———

যুব আন্দোলনের উদ্দেশ্য

নূতনের সন্ধান আনা, নূতন সমাজ, নূতন রাষ্ট্র, নূতন অর্থনীতির প্রবর্ত্তন করা; মানুষের মধ্যে নূতন ও উচ্চতর আদর্শ উদ্‌বুদ্ধ করিয়া তাহাকে মনুষ্যত্বের উচ্চতর সোপানে লইয়া যাওয়া যুব আন্দোলনের উদ্দেশ্য। এই অশান্ত, অসন্তুষ্ট বিদ্রোহী মন যার আছে যে ব্যক্তি বর্ত্তমান ও বাস্তবের অবগুণ্ঠন সরাইয়া মহত্তর জীবনের দৃষ্টি ও আস্বাদ পাইয়াছে, সেই ব্যক্তি যুব আন্দোলনের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে এবং যুব সমিতি গঠনে অধিকারী হইয়াছে। যে প্রতিষ্ঠান বা

আন্দোলনের মূলে স্বাধীন চিন্তা বা নূতন প্রেরণা নাই তাহা তরুণের প্রতিষ্ঠান বা আন্দোলন বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না। যুগে যুগে তরুণের প্রাণ বার্দ্ধক্যের বিরুদ্ধে, অনুকরণেচ্ছার বিরুদ্ধে, ভীরুতার বিরুদ্ধে, ক্লৈবের বিরুদ্ধে, অজ্ঞতার বিরুদ্ধে এবং সর্ব্বপ্রকার বন্ধনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া আসিতেছে।

অতি মানব

যে জাতির শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ অতি মানবের স্বপ্ন দেখেন না—সে জাতির কি আদর্শবাদ আছে? এবং যে জাতির আদর্শবাদ নাই সে জাতি কি জীবন্ত ও সে জাতি কি মহত্তর সৃষ্টির অধিকারী হইতে পারে?

আদর্শ চাই

মানুষের সমস্ত প্রাণ যদি উদ্বুদ্ধ করিতে হয় তাহার প্রত্যেক রক্তবিন্দুর মধ্যে যদি মৃতসঞ্জীবনী সুধা ঢালিতে হয়, তাহার অন্তর্নিহিত শক্তির যদি স্ফুরণ ঘটাইতে হয় তবে একটা মহত্তর আদর্শের আস্বাদ তাহাকে দেওয়া চাই।

আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র

আমাদের একটা স্বপ্ন আছে, সে স্বপ্ন আমাদের শক্তির উৎস, আনন্দের নির্ঝর। এই স্বপ্নের প্রেরণায় আমরা উঠি, বসি, চলা-ফেরা করি, লিখি, বলি, কাজকর্ম্ম করি। সে স্বপ্ন বা আদর্শ কি? আমি চাই একটা নূতন সর্ব্বাঙ্গীন মুক্তি-সম্পন্ন সমাজ এবং তার উপরে একটা স্বাধীন রাষ্ট্র। আমি সেই সমাজ ও রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখি। এই স্বপ্ন আমার নিকট নিত্য ও অখণ্ড সত্য। এই সত্য সার্থক করিবার চেষ্টায় প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেও "সে মরণ স্বরগ-সমান।" আমার সম্পদ কিছুই নাই—আছে শুধু এই স্বপ্ন যাহা আমাকে অসীম শক্তি ও অপার আনন্দ দিয়াছে।

নূতন প্রোগ্রামের জন্য চীৎকার

আমাদের মধ্যে একদল লোক আছেন যাহারা "প্রোগ্রাম প্রোগ্রাম" বলিয়া চীৎকার করেন কিন্তু তাহারা তলাইয়া দেখেন না যে নূতন মানুষ তৈয়ার না করিলে সে প্রোগ্রামের মূল্য বুঝিবে কে?

নূতন প্রোগ্রাম আমার একটা আছে কিন্তু সে প্রোগ্রাম দিবার সময় এখনও আসে নাই। আসিবে সেইদিন যেদিন নূতন মানুষ প্রস্তুত হইবে যাহারা সেই কর্ম্ম পদ্ধতি গ্রহণ করিয়া তাহা কাজে লাগাইতে পারিবে। নূতন মানুষ তৈয়ার করিবার চেষ্টায় আমি

নিরত। ছাত্র আন্দোলন; যুব আন্দোলন, নারী আন্দোলন প্রভৃতির সাহায্যে যদি নূতন মানুষ—পুরুষ ও নারী প্রস্তুত হয় তখন নূতন প্রোগ্রাম দিলে তার সর্থকতা হইবে।

স্বাধীনতার অখণ্ড রূপ

আমাদের আদর্শ—দেশের ও সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন মুক্তি। সর্ব্বাঙ্গীন মুক্তির বাণী গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে প্রচার করিতে হইবে। স্বাধীনতার অখণ্ড রূপ আমরা উপলব্ধি করিতে পারি নাই। অখণ্ডরূপের উপলব্ধি জাতির মানস ক্ষেত্রে একদিন আসে না। বহুদিনের সাধনার ফলে এবং বহু বৎসর খণ্ড খণ্ড রূপ দেখিবার পর আমরা আজ অখণ্ডরূপের উপলব্ধি পাইতেছি। সমগ্র জাতিকে বুঝাইয়া দিতে হইবে স্বাধীনতার অখণ্ডরূপ কি। পূর্ণ সাম্যবাদের উপর নূতন সমাজকে গড়িয়া তুলিতে হইবে।......এসো আমরা সকলে মিলিয়া পবিত্র মাতৃযজ্ঞে যোগদান করি।

রক্তের সংমিশ্রণ

জাতির রক্তস্রোত যেন ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে; এখন চাই নূতন রক্ত। ভারতে বহুবার রক্ত সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। এই রক্ত সংমিশ্রণের ফলে ভারতীয় জাতি বার বার মৃত্যুর মুখে পতিত হইয়া পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়াছে। যাহারা বর্ণশঙ্করের ভয় করেন

তাহারা আমাদের জাতির ইতিহাস জানেন না। আজ অসবর্ণ বিবাহ অনুমোদন করিয়া রক্ত সংমিশ্রণের সহায়তা করিতে হইবে। নূতন সভ্যতার সৃষ্টির মূলে খানিকটা রক্ত সংমিশ্রণের আবশ্যকতা আছে। অসবর্ণ বিবাহের প্রবর্ত্তনের দ্বারা রক্তসংমিশ্রণের ফলে আমরা জীবনীশক্তি ফিরিয়া পাইব।

প্রেরণা শক্তি

আমাদের দেশে ব্যক্তির বা জাতির জীবনে প্রেরণা বা initiative হ্রাস পাইয়াছে। আমরা বাধ্য না হইলে বা কশাঘাত না খাইলে সহজে কিছু করিতে চাই না।...বাস্তবের দৈন্যকে অগ্রাহ্য করিয়া আদর্শের প্রেরণায় জীবনটাকে অনেক সময় হাসিতে হাসিতে বিলাইয়া দেওয়া প্রয়োজন—একথা আমরা কার্যতঃ স্বীকার করিতে চাহি না। এইজন্য প্রেরণা বা initiative এর অভাবের দরুণ ব্যক্তি ও জাতির ইচ্ছাশক্তি ক্রমশঃ ক্ষীণ ও নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। শুধু আদর্শের প্রেরণাতেই ইচ্ছাশক্তি জাগরিত হয়। আমরা আদর্শ ভুলিয়াছি বলিয়াই আমাদের ইচ্ছাশক্তি এত ক্ষীণ। বর্ত্তমানের ভাবদৈন্য বিদূরিত করিয়া নিজ নিজ জীবনে আদর্শ প্রতিষ্ঠা না করিতে পারিলে আমাদের প্রেরণা শক্তি জাগিবে না এবং প্রেরণা শক্তি না জাগিলে চিন্তাশক্তি ও কর্ম্মপ্রচেষ্টা পুনর্জ্জীবিত হবে না।......আজ আমাদের সেই যাদুকরের দণ্ডেরই প্রয়োজন যে দণ্ড সঞ্চালনে

আমাদের সমাজের সর্ব্বত্র সাজ সাজ রব উঠিবে। **স্বাধীনতার জন্য, সম্প্রসারণের জন্য, আত্মবিশ্বাসের জন্য যে ঐকান্তিক আগ্রহ তাহাই এই প্রেরণাদায়িনী শক্তি।**

বিদেশী মতবাদ

প্রথমতঃ পৃথিবীর সকল মতবাদের যেমন Socialism, Anarchism, Bolshevism, Facism, Communism ভিতর অল্প বিস্তর সত্য আছে কিন্তু এই ক্রমোন্নতিশীল জগতে কোনও মত চরম সত্য বা চরম সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করা বোধ হয় যুক্তিসঙ্গত কাজ নয়। দ্বিতীয়তঃ একথা ভুলিলে চলিবে না যে কোনও দেশের কোনও প্রতিষ্ঠানকে সমূলে উৎপাটন করিয়া আনিয়া বলপূর্ব্বক অন্য দেশে রোপণ করিলে সুফল লাভ করিতে পারে। প্রত্যেক জাতীয় প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি হয় সেই দেশের ইতিহাসের ধারা, ভাব, আদর্শ ও নিত্য নৈমিত্তিক জীবনের প্রয়োজন হইতে।...... ... Marxএর মতবাদ পূর্ণরূপে গ্রহণ করিলে আমাদের দেশ সুখ সমৃদ্ধিতে ভরিয়া উঠিবে একথা অনেকে বিশ্বাস করেন।...রুশিয়া Marxian মতবাদ গ্রহণ করিবার সময় প্রাচীন ইতিহাসের ধারা, জাতীয় আদর্শ, বর্ত্তমানের আবহাওয়া, নিত্য নৈমিত্তিক প্রয়োজনের কথা ভুলিয়া যায় নাই। রুশিয়ার Bolshevism ও Marxïan Socialism এর মধ্যে পার্থক্য অনেক। আমি অন্য আদর্শ বা প্রতিষ্ঠান অন্ধভাবে অনুকরণ করা বিরোধী। পরাধীন দেশে যদি কোন ism গ্রহণ করিতে

হয় তবে তাহা Nationalism…কোন ism এর বা মতবাদের দ্বারা মানবজাতির উদ্ধার হইতে পারে না যদি সর্ব্বাগ্রে আমরা মনুষ্যোচিত চরিত্রবল লাভ করিতে না পারি। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন—"Man making is my mission"

বাধাবিপত্তি

চিন্তা ও কর্ম্মের নব ধারার প্রবর্ত্তন করিতে গেলে যে বর্ত্তমান ভাবধারা ও স্বার্থের এবং শক্তিশালী দলের সহিত আমাদের বিরোধ বাধিবে তাহা খুবই স্বাভাবিক কিন্তু তাহাতে ভীত হইলে আমাদের চলিবে না। বিরোধ ও বহু বাধার মধ্য দিয়া যুব আন্দোলনকে অগ্রসর হইতে হইবে। এমন সময় আসিবে যখন আমরা চারিদিক হইতে বাধা পাইব এবং সমস্ত জগৎ হইতে যেন বিচ্ছিন্ন এইরূপ মনে হইবে। সেই সঙ্কট সময়ে আমাদের সেই আইরিশ মহাপুরুষের বাণী মনে রাখিতে হইবে যিনি আসন্ন বিপদের মধ্যে দাঁড়াইয়া দৃপ্তকণ্ঠে বলিয়াছিলেন—"জগৎকে যেমন একজন (খৃষ্ট) উদ্ধার করিয়াছিলেন আয়র্লণ্ডকে তেমন একজনই উদ্ধার করিবে।"

যুব আন্দোলনের সার্থকতা

ব্যক্তি ও জাতির প্রাণে নিশ্চয়ই এমন কোনও গভীর আকাঙ্ক্ষা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে যাহার ফলে যুব আন্দোলনের সৃষ্টি

হইয়াছে। অন্তরের সেই মূলগত আকাঙ্ক্ষা হইতেছে **স্বাধীনতার** আকাঙ্ক্ষা, দেশ ও জাতির সর্ব্বপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, আপনাকে সার্থক করিবার আকাঙ্ক্ষা। কংগ্রেস রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। ইহার উদ্দেশ্য সীমাবদ্ধ। যুব আন্দোলন জীবনকে সমগ্রভাবে দেখিতে চায় এবং সকল ক্ষেত্রেই স্বাধীনতা চায়। একটা সঙ্কলতা, বর্ত্তমানের সমাজ ব্যবস্থার প্রতি অসন্তোষ, বন্ধন, স্বেচ্ছাচারিতা ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ যুব আন্দোলনের বৈশিষ্ট। জীবের যত দিক আছে যুব আন্দোলনে তত দিক থাকিবে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শরীরগত, শিক্ষাগত ও দীক্ষাগত যুব আন্দোলনের এই পাঁচটি দিক আছে।

জনপ্রিয়তা

আমাদের জনপ্রিয় হওয়ার লোভ একবারে ত্যাগ করিতে হইবে। কখন কখন জনসাধারণের মনের উচ্ছ্বাস দমন করার দায়িত্বও আপনাদিগকে লইতে হইবে। সমসাময়িক ব্যক্তিদের চেয়ে দৃষ্টি বহুদূর প্রসারিত করিতে হইবে। বন্ধুহীন অবস্থায় একাকী দাঁড়াইয়া সমস্ত জগতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে পারার মত সাহস আপনাদের মনে জাগরূক থাকা চাই। জনপ্রিয়তার স্রোতে যে চিরদিন ভাসিয়া থাকিতে চায় যে হয়ত সাময়িকভাবে সাধারণের প্রশংসা লাভে সমর্থ হয় কিন্তু ইতিহাসে অমর হইতে পারে না। ভবিষ্যতের

ইতিহাস সে সৃষ্টি করিতে পারে না। অত্যন্ত নিঃস্বার্থ কাজের জন্য নিন্দা ও বিদ্রূপ, নিকটতম বন্ধুর নিকট হইতে ঈর্ষা ও শত্রুতা —ইহাতে আশ্চর্য্য হইলে চলিবে না।

আঘাত বিপদ আছে বলিয়াই ত জীবনের মূল্য—ত্যাগ, শোক, অত্যাচার না থাকিলে কি জীবনের কোন সৌন্দর্য্য কোন বিচিত্রতা থাকিত।

অসত্য, কপটতা, বন্ধন ও সাম্যের অভাবকে কোন মতেই মানিয়া চলা যায় না। স্বাধীনতার প্রচেষ্টায় অনেক জিনিষ নির্দ্দয় ভাবে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হয়।

কি চাই?

আমরা সংস্কার চাই না—মূলগত (সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়) রূপান্তর চাই। আমাদের স্বাধীনতার অর্থ—সকল প্রকার বন্ধন হইতে মুক্তি। আমাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা চাই—রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতা। নরনারী নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক মানবেরই একটা জন্মগত সাম্য আছে। তাহাকে বিকশিত করিবার সকল সুযোগই দিতে হইবে।

স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা

আমরা যদি হৃদয়ের গভীর অন্তঃস্থল হইতে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা করিতে চাই তাহা হইলে **আমাদের দাসত্বের বেদনা ও বন্ধনের দুঃখকে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে হইবে।** এই অনুভূতি যখন তীব্র হইবে তখন আমরা একথা উপলব্ধি করিতে পারিব যে স্বাধীনতাহীন হইয়া বাঁচিয়া থাকার কোন মূল্য নাই এবং এই অভিজ্ঞতা বাড়িয়া চলার সঙ্গে সঙ্গে এমন দিন আসিবে যেদিন সকল প্রাণ স্বাধীনতা তৃষ্ণায় পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে।

সাম্য

স্বাধীনতা ও সাম্যের প্রেরণা পথ নিরোধকারী আচার যুগ, সঞ্চিত বাধা, জীবনের সকল মিথ্যা মাপকাঠিকে চূর্ণ বিধ্বস্ত করিয়া নবসৃষ্টির পথ সুগম করিয়া দিবে। মুক্তি, সাম্য ও মৈত্রীর উপর নব সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে।

পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব

মনে রাখিবেন আমাদের সমবেত চেষ্টায় ভারতবর্ষে নূতন জাতি সৃষ্টি করিতে হইবে। পাশ্চাত্য সভ্যতা আমাদের সমাজে ওতঃপ্রোতভাবে প্রবেশ করিয়া আমাদিগকে ধনেপ্রাণে মারিতে চেষ্টা

করিতেছে। আমাদের ধর্ম্মকর্ম্ম, শিল্পকলা মরিতে বসিয়াছে। তাই জীবনের সকল ক্ষেত্রে আবার মৃতসঞ্জীবনী সুধা ঢালিতে হইবে। এ সুধা কে আহরণ করিয়া আনিবে ?

আত্মাহুতি

জীবন না দিলে জীবন পাওয়া যায় না। আদর্শের কাছে যে ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে নিজেকে বলিদান দিয়াছে শুধু সেই ব্যক্তি অমৃতের সন্ধান পাইতে পারে আমরা সকলেই অমৃতের পুত্র কিন্তু ক্ষুদ্র অহমিকার দ্বারা পরিবৃত বলিয়া অন্তর্নিহিত অমৃত সিন্ধুর সন্ধান পাই না। আমি আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছি "আসুন মায়ের মন্দিরে গিয়া আমরা সকলে দীক্ষিত হই। আসুন আমরা সকলে এক বাক্যে প্রতিজ্ঞা করি যে দেশ-সেবা আমাদের জীবনের একমাত্র ব্রত। দেশমাতৃকার চরণে আমরা আমাদের সর্ব্বস্ব বলি দিব এবং মরণের ভিতর দিয়া অমৃত লাভ করিব।"

শ্রমিক ও কৃষক

দেশ ব্যক্তি বিশেষের বা সম্প্রদায় বিশেষের সম্পত্তি নয় এবং কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি শ্রমিক, কি ধনিক কোন সম্প্রদায় বিশেষের পক্ষে সকলের সহযোগিতা ব্যতীত স্বরাজলাভ লাভ সম্ভব নয় কিন্তু সকলের ন্যায্য দাবী আমাদিগের স্বীকার করিতে হইবে, সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিক ও কৃষক সম্প্রদায়ের সহযোগ ব্যতীত স্বরাজলাভের আশা

দুরাশা মাত্র এবং তাহারা যে পর্য্যন্ত সঙ্ঘবদ্ধ না হইতেছে ততদিন তাহাদিগের পক্ষে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান সম্ভবপর নয়।

শিক্ষিত সম্প্রদায়

মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ই দেশের মেরুদণ্ড, গণ আন্দোলনের অগ্রদূত। কিন্তু আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে আদর্শনিষ্ঠার অভাব। এই ভাবদৈন্যের কারণ আমাদের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আদর্শের বীজ আমাদের হৃদয়ে বপন হয় না। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙ্গিনায় কি মুক্তির বায়ু খেলিতে পায়? যাহারা ঐ আঙ্গিনায় জ্ঞানাহরণের জন্য বিচরণ করে তাহারা কি মুক্তির আদর্শে অনুপ্রাণিত! আমাদের ভাবদৈন্যের জন্য শিক্ষিত সম্প্রদায় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ প্রধানতঃ দায়ী। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে তাকাইলেই বুঝিতে পারা যায় যে আমাদের জাতীয় দুর্দ্দশা কতদূর পৌঁছাইয়াছে। অধ্যাপকগণ নিজ নিজ জীবনের আদর্শ ও শিক্ষার প্রভাবে মানুষ সৃষ্টি করিতে অক্ষম হন।·· ···শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আর্থিক অবস্থা কৃষকদের আর্থিক অবস্থার চেয়ে অনেক বিষয়ে খারাপ। চাকরির দ্বারা তাহাদের অভাব মিটিতে পারে না কারণ শিক্ষিত যুবকের সংখ্যা চাকরির চেয়ে অনেক বেশী। আমরা যদি চাকরির আশা পরিত্যাগ করিয়া ব্যবসা বাণিজ্যে মন না দিই তবে আমরা ত মরিবই এবং সঙ্গে সঙ্গে সন্তান সন্ততিদের মরিবার আয়োজন করিয়া যাইব। আমাদের অধ্যবসায়, চরিত্রবল ও কষ্ট সহিষ্ণুতার দ্বারা ব্যবসায় ক্ষেত্রে কৃতিত্বলাভ করিতে হইবে। "নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"

League of Young Intellectuals :—যাহারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সৃষ্টির কার্য্যে ব্যাপৃত তাহাদের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান যাহাতে হয় তার জন্য একটা League of Young Intellectuals গঠন করা আবশ্যক। কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, বণিক, বৈজ্ঞানিক এবং সকল ক্ষেত্রের কর্ম্মী এই League এর সভ্য হইবেন। এক কথায় যাহারা "best brain of the entire nation" তাহাদের মধ্যে ভাবের আদান প্রদানের সুযোগ করিয়া দিতে হইবে এবং তাহারা সকলে যাহাতে একই লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সৃষ্টি কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়া সমগ্রজাতিকে সবল, সুস্থ ও কৃতি করিয়া তোলেন তাহার আয়োজন করিতে হইবে।

কেন্দ্রীয় যুব সমিতি

যুবকদের কর্ম্ম প্রচেষ্টা যাহাতে ভিন্নমুখী ও পরস্পর বিরোধী না হয় এবং যাহাতে সকল চেষ্টা সংযত ও সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া একই আদর্শের দিকে পরিচালিত হয় তার জন্য কেন্দ্রীয় সমিতির আবশ্যকতা।

আমাদের অভাব

বাস্তবের দিক হইতে দেখিলে আমাদের অভাব তিন প্রকার :—(১) অন্নাদির অভাব, (২) বস্ত্রাদির অভাব, (৩) শিক্ষাদির অভাব। আমরা অন্ন চাই, বস্ত্র চাই, শিক্ষা চাই। কিন্তু মূল সমস্যার দিক হইতে দেখিলে প্রতীয়মান হইবে যে **আমাদের জাতীয় দৈন্যের প্রধান কারণ**

ইচ্ছাশক্তি ও প্রেরণার অভাব। সুতরাং আমাদের যদি National will বা ইচ্ছাশক্তি জাগরিত না হয় তাহা হইলে শুধু অন্ন, বস্ত্র ও শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেই জাতীয় সমস্যার সমাধান হইবে না। Benevolent despotএর মত সরকার বাহাদুর অথবা Local Bodyরা যদি জনসাধারণের অন্ন, বস্ত্র ও শিক্ষার ব্যবস্থা করেন তাহা হইলেও আমরা মানুষ হইতে পারিব না।

পল্লী সংস্কার

আমাদের সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখা উচিত যাহাতে পল্লীবাসীরা প্রধানতঃ নিজেদের চেষ্টায় অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যবস্থা করেন। প্রথম অবস্থায় গ্রামের বাহির হইতে সাহায্য পাঠানো দরকার কিন্তু শেষ পর্যন্ত যদি পল্লীবাসীরা স্বাবলম্বী ও আত্মনির্ভরশীল হইতে না পারেন তাহা হইলে পল্লীসংস্কারের কোনও সার্থকতা নাই। সাধারণতঃ গ্রামবাসীদের মধ্যে পরমুখাপেক্ষিতার ভাবই প্রবল।

রাজনীতিতে বিবাদ

রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে বিভিন্ন আদর্শ, বিভিন্ন কর্ম্ম পদ্ধতি এবং মতানৈক্য থাকা স্বাভাবিক। মতান্তর অনেক সময় মনান্তরে পরিণত হয় এবং তার উপর যখন ব্যক্তির আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে তখন দলাদলি আরও তিক্ত ও বিষাক্ত হইয়া উঠে। রাজনীতিতে মতান্তর হওয়া অনিবার্য্য কিন্তু মতান্তর যেন মনান্তরে পরিণত না হয়

এবং ব্যক্তিগত নিন্দা বা গালাগালি যেন আমাদের অস্ত্র না হয়, ভোটের পরিবর্ত্তে যেন আমরা ছোরা বা লাঠি ব্যবহার না করি।

কাজের সুযোগ

যে ব্যক্তি ক্রমাগত অভিযোগ করে যে, সে কাজ করিবার সুযোগ বা কর্ম্মক্ষেত্র পাইতেছে না—সে কস্মিন কালেও তাহা পাইবে না এবং যে ব্যক্তি অভিযোগ না করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় তাহার সুযোগ বা কর্ম্মক্ষেত্রের অভাব কোনদিনও হয় না।

তরুণ সমাজ

সর্ব্বদেশে তরুণ সমাজ অসন্তুষ্ট ও অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা যাহা চায় তাহা পায় না। যে আদর্শকে তাহারা ভালবাসে সে আদর্শ বাস্তবের মধ্যে মূর্ত্ত করিয়া তুলিতে পারে না। তাই তাহারা বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে এবং যে মানুষ বা যে ব্যবস্থা তাহাদের কর্ম্মপথে অন্তরায় হইয়াছে তাহা অপসারিত করিবার জন্য তাহারা বদ্ধপরিকর।

SPIRIT OF ADVENTURE

পাশ্চাত্য জাতি নূতনের সন্ধানে ছুটিতে পারে বলিয়া তাহারা এত উন্নতি করিতে পারিয়াছে। নূতনের আকর্ষণে তাহারা গতানুগতিক পন্থা ত্যাগ করিতে পারে কিন্তু আমরা "অজানার" জন্য

সর্ব্বদাই ভীত। বাহির অপেক্ষা আমরা যেন ঘরকেই ভালবাসি। আমি বাঙ্গালির তরুণ সমাজকে বলিতে চাই—বাহিরের জন্য, "অজানার" জন্য পাগল হইতে শিখ। ঘরের কোণে বা দেশের কোণে লুকাইয়া থাকিলে চলিবে না।

তরুণের আদর্শ

বর্ত্তমানের সকল বন্ধন, অত্যাচার, অবিচার, অনাচার ধ্বংস করিয়া নূতন সমাজ ও নূতন জাতি সৃষ্টি করা, প্রাচীনের ও বর্ত্তমানের উচ্চ প্রাচীর অতিক্রম করিয়া সুদূরের সন্ধান করা এবং সুদূরের স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করা—তরুণের আদর্শ। তরুণ বর্ত্তমানকে বা বাস্তবকে অত্যন্ত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে না। সে চায় ধ্বংসের মহাশ্মশানের বুকে সৃষ্টির অবিরাম তাণ্ডব নৃত্য। ধ্বংস ও সৃষ্টি লীলার মধ্যে যে আত্মহারা হইতে পারে একমাত্র সেই ব্যক্তিই তরুণ। তারুণ্য যার আছে সে ধ্বংস ও সংগ্রামের ছায়া দর্শনে ভীত হয় না অথবা নবসৃষ্টিরূপ কাজে অপারগ হয় না। বৃদ্ধ হইয়াও মানুষ তরুণ হইতে পারে যদি তার প্রাণ সবুজ থাকে, আর তরুণ হইয়াও মানুষ বৃদ্ধ হইতে পারে যদি তার অবস্থা হয় "বৃদ্ধত্বম জরস্ত বিনা"।

আত্মবলিদান

আমাদের সব আছে—প্রকৃতি, সৌন্দর্য্য, শারীরিক বল, শিক্ষা, দীক্ষা, শৌর্য্য, বীর্য্য, বিদ্যা বুদ্ধির কোনটির অভাব নাই। এ সব

উপাদান লইয়া নিখুঁত মূর্ত্তি রচনা হইতে পারে কিন্তু প্রাণ প্রতিষ্ঠার আয়োজন কোথায়? প্রাণ প্রতিষ্ঠা সেই দিন হইবে যে দিন সমগ্র জাতির মধ্যে মুক্তিলাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হইবে।

আমাদের আছে সবই—**শুধু নাই একবস্তু—নিঃশেষে আত্ম-বলিদান**—একটি আদর্শের পশ্চাতে সারাজীবন অনুধাবনের ক্ষমতা যাকে বলে tenacity of purpose। আমরা দেশকে অন্তরের সঙ্গে ভালবাসি না, আমরা করি গৃহবিবাদ। আমাদের মধ্যে জন্মায় মিরজাফর, উমিচাঁদ। মিরজাফর, উমিচাঁদ আজও মরে নাই। *এখনও* তাহাদের বংশবৃদ্ধি হইতেছে। আমরা যদি দেশকে ভালবাসিতে শিখি তবে আত্মবলিদানের ক্ষমতা লাভ করিব। আমরা অবিরাম ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ক্ষমতা লাভ করিব। বনে জঙ্গলে যুগ যুগান্তর তপস্যা করিলেও পাইব না, পাইব নিষ্কাম কর্ম্মের মধ্যে জীবন ঢালিয়া দিলে অবিরাম সংগ্রামে লিপ্ত হইলে।

স্বাধীন ভারত

আমি নিজেকে স্বপ্নবিলাসী বলিয়া স্বীকার করিতেছি। আমার নিকট এই সমস্ত স্বপ্নই কঠোর বাস্তব সত্য বলিয়া মনে হয়। এই স্বপ্ন হইতে আমি উদ্দীপনা লাভ করি। কাজ করিবার শক্তি আমার প্রাণে জাগে, স্বপ্ন বিনা জীবনের কোন মাধুর্য্যই থাকে না।

আমার স্বপ্ন স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন। আপনার প্রভায় গৌরবান্বিত সমুজ্জ্বল ভারতের স্বপ্ন। আমি চাই—এই ভারতে স্বাধীন গণতন্ত্র *প্রতিষ্ঠিত হউক, তাহার সৈন্য, তার নৌবল, তার বিমানপোত, তাহার*

সমস্তই স্বাধীন হউক। আমি চাই পৃথিবীর স্বাধীন দেশ সমূহে স্বাধীন ভারতের দূত প্রেরিত হউক।

নূতন সমাজ

নূতন সমাজের গোড়ার কথা হইবে সকলের জন্য সমান অধিকার, সমান সুযোগ। ঐশ্বর্য্যের উপর সকলের সমান অধিকার। বৈষম্য মূলক সামাজিক বিধান প্রত্যাহার, জাতিভেদ প্রথার বিলোপ এবং বৈদেশিক শাসন হইতে মুক্তি।

অন্তরের জাগরণ

অন্তরের দিক হইতে যে জাগরণ সেই জাগরণই আমরা চাই। কেবল তাহাতে আমাদের এই জীবনের আমূল পরিবর্ত্তন সম্ভবপর হইতে পারে। এখানে সেখানে একটু আধটু সংস্কার ছাড়া কাজ হইবে না। সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন, সম্পূর্ণ নূতন জীবন পরিগ্রহণই আমাদের বর্ত্তমানের প্রয়োজন।

ধারণার পরিবর্ত্তন

এই জরাজীর্ণ দেশের যৌবন ফিরাইয়া আনিতে হইলে, সমগ্র ভারতে একটি জাতি গঠন করিতে হইলে, ভাল ও মন্দ সম্পর্কে

আমাদের যে ধারণা এত দিন বদ্ধমূল ছিল তাহার আমূল পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।

নেতাজীর শেষবাণী

ফরমোসা দ্বীপে বিমান দুর্ঘটনার পর কর্ণেল হবিবর রহমানকে নেতাজী নিম্নলিখিত বাণী দিয়াছিলেন,—"আপনি দেশবাসীকে গিয়া বলিবেন যে **আমি আমার শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত ভারতের মুক্তিসাধনের জন্য লড়িয়াছি।**

নেতাজীর জন্মদিবসে শাহ নওয়াজের বাণী

মুক্ত আজাদি সৈন্যদের কর্ত্তব্য—জাতীয় জীবনে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা ও সংগঠন করা, সাম্প্রদায়িক বৈষম্য দূর করা। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস আমার শরীরের অস্থিমজ্জার সমান। আমরা চল্লিশকোটী ভারতবাসীর সেবক। সর্ব্বপ্রকার ভেদ বৈষম্য ভুলিয়া স্বাধীনতা সংগ্রামকে সফল করিব। আজ নেতাজী আমাদের মধ্যে নাই। এতদিন আমরা অস্ত্র লইয়া যুদ্ধ করিয়াছি, এখন আমরা মহাত্মাজীর নেতৃত্বাধীনে অন্যভাবে যুদ্ধ চালাইব।

নেতাজীর বাণী

১

[বার্লিন, ৫ই মে]

"এই বিপুল পৃথিবীতে ভারতবর্ষের একটি মাত্র শত্রু আছে, যে শত্রু শতাধিক বর্ষকাল তাহাকে শোষণ করিয়াছে, যে শত্রু ভারতমাতার জীবন-শোণিত চুষিয়া লইতেছে—**সে শত্রু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ**। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ যে দিন পরাভূত হইবে, সেই দিনই ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবে। এই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অবিচ্ছিন্ন আপোষহীন সংগ্রামেই আমার সমস্ত জীবন কাটিয়াছে। আমি শৈশব হইতেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে চিনিয়াছি। কূটনীতিতে ওস্তাদ তাহারা; কিন্তু সকল চেষ্টা সত্ত্বেও তাহারা আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে বাধা দিতে পারে নাই, পৃথিবীর কোনও শক্তিই তাহা পারিবে না। আমি আজীবন ভারতবর্ষের সেবক, জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমি তাহাই থাকিব। পৃথিবীর যে অংশেই আমি থাকি না কেন, একমাত্র ভারতের প্রতিই আমার আনুগত্য ও ভক্তি আজকার মত চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকিবে।"

২

প্রথম আজাদি ঘোষণা

[১৯৪৩ সাল ৫ই জুলাই]

"আজ আমার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবের দিন। আজ বিধাতা সদয় হইয়া আমাকে অদ্বিতীয় সম্মানে ভূষিত করিলেন। আমি সমস্ত জগতের কাছে ভারতের মুক্তিফৌজের অস্তিত্বের কথা

নিবেদন করিবার গৌরব লাভ করিলাম। সিঙাপুরের সমরক্ষেত্রে এই ফৌজ আজ সামরিক শ্রেণীবদ্ধতায় সজ্জিত হইয়াছে, সেই সিঙাপুর যাহা একদা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দুর্ভেদ্য দুর্গ ছিল। এই ফৌজ **ব্রিটিশের বন্ধন জোয়াল হইতে ভারতবর্ষকে মুক্ত করিবে।** সমস্ত ভারতবাসীর ইহা গর্ব্বের বিষয় যে, এই ভারতীয় ফৌজ সম্পূর্ণ ভারতীয় নেতৃত্বে সংগঠিত হইয়াছে এবং সেই ঐতিহাসিক মুহূর্ত্ত যখন আসিবে ভারতীয় নেতৃত্বেই ইহা সমরাভিযান করিবে। বন্ধুগণ! আমার সৈন্যগণ! "দিল্লী চলো, দিল্লী চলো" ইহাই তোমাদের যুদ্ধধ্বনি হউক। আমি নিশ্চিন্ত জানি যে, শেষ পর্য্যন্ত আমরা জয়লাভ করিবই। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাদের মৃতাবশিষ্ট বীরেরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্যতম সমাধিক্ষেত্র প্রাচীন দিল্লীর লালকেল্লায় সশস্ত্র শোভাযাত্রা করিতে পারে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের কর্ত্তব্য শেষ হইবে না। এইকথা বিশ্বাস কর যে অন্ধকারে এবং রৌদ্রালোকে সুখে দুঃখে চরমতম দুর্দ্দশায় ও বিজয়ের আনন্দে আমি তোমাদের সঙ্গে থাকিব। আপাততঃ তোমাদিগকে ক্ষুধা তৃষ্ণা, যন্ত্রনা, সুদীর্ঘ পথ এবং মৃত্যু ছাড়া আমার কিছুই দিবার নাই।"

৩

১৯৪৫ সালের জানুয়ারী—"ইম্ফলের পার্ব্বত্য অঞ্চলে এবং চট্টগ্রামের সমতল ভূমিতে ভারতের স্বাধীনতার ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। আমাদের সামরিক ধ্বনি হইবে **"দিল্লী চলো"** এবং **"রক্ত, আরও রক্ত চাই"** অর্থাৎ আমরা স্বাধীনতার জন্য রক্তপাত করিব এবং শত্রুর রক্ত ক্ষয় করিব। অসামরিক লোকদের ধ্বনি হবে **করো সব নিচবর, বনোসব ফকির** (সর্ব্বস্ব বলি দিয়ে ফকির হও)।"

৪

বিশ্বাস ঘাতকতার শাস্তি

১৯৪৫ সালের ১৩ই মার্চ্চের ঘোষণা :—

আজাদি ফৌজের কয়েকজন কাপুরুষতা প্রদর্শন ও বিশ্বাসঘাতকতা করায় নেতাজী এই উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত ঘোষণা করেন :—(১) কাপুরুষ সৈনিক ও অফিসারদিগকে বন্দী করা হইবে। (২) বিশ্বাসঘাতকদের গুলি করা হইবে। যাহারা কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হইয়া কাজ করিতে না চাহেন, ভবিষ্যতে বীরত্বের সহিত সংগ্রাম করিতে না চাহেন তাহারা এই বিজ্ঞপ্তির এক সপ্তাহের মধ্যে কাজ ছাড়িয়া দিবেন। (৩) যাহাদিগকে সন্দেহ করা হইবে যে সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে বিশ্বাসঘাতকতা করিবে তাহাদিগকে ফৌজ হইতে বহিষ্কৃত করা হইবে। সকলকেই অনুরোধ করা হইতেছে যে তাহারা এইরূপ বিশ্বাসঘাতকের সংবাদ আমাকে দেন। (৪) ভবিষ্যতে যদি কাহারও কাপুরুষতা বা বিশ্বাস-ঘাতকতার প্রবৃত্তি প্রকাশ পায় তবে তাহা আমাকে জানাইবেন। প্রত্যেকেই ফৌজের ও ভারতের সম্মান ও সুখ্যাতির জন্য দায়ী। (৫) প্রত্যেকে মনে রাখিবে সৈনিকের পক্ষে কাপুরুষতা ও বিশ্বাসঘাতকতা অপেক্ষা ঘৃণ্য ও জঘন্য অপরাধ আর নাই। (৬) সেনাবাহিনীর উপরোক্ত ছাঁটাই এর পর সকলকে নূতন করিয়া শপথ গ্রহণ করিতে হইবে। (৭) কাপুরুষ ও বিশ্বাকঘাতককে ধরাইয়া দিতে পারিলে পুরস্কার দেওয়া হইবে। (৮) কাপুরুষ ও বিশ্বাসঘাতকের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিবার জন্য একটি বিশেষ অনুষ্ঠান হইবে। তাহাতে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা হইবে :—(ক) বিশ্বাসঘাতকদের বিরুদ্ধে ঘৃণাসূচক কবিতা ও প্রবন্ধ পঠিত হইবে। (খ) ঘৃণাসূচক নাটক অভিনীত হইবে। (গ) রিয়াদ, মদন, সরবারি, দে, মহম্মদ বকস প্রভৃতি

বিশ্বাসঘাতকদের প্রতিমূর্ত্তি কার্ডবোর্ড, খড় বা কাঠি দিয়া মনুষ্যাকৃতির বা কোন জন্তুর আকারে তাঁবুতে তৈয়ার করিয়া প্রত্যেকেই এই প্রতিমূর্ত্তির উপর ঘৃণা ও বিদ্বেষ চরমভাবে অভিব্যক্ত করিবেন। (ঘ) ভারতীয় বীরগণের গুণগান করিয়া ও ফৌজের সৈনিকের বীরত্ব প্রশংসা করিয়া বক্তৃতা হইবে।

৮

কেন আমি বাঙ্গলা ত্যাগ করিলাম?

[১৯৪৩ সালের ৯ জুলাই]

সিঙ্গাপুরের বক্তৃতার অংশ :—

.........আমার বহুমুখী অভিজ্ঞতা দ্বারা বিচার করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, ভারতবর্ষের মধ্য হইতে আমরা যত তীব্র আন্দোলনই করি না কেন তাহা আমাদের দেশকে ব্রিটিশ প্রভুত্ব হইতে মুক্ত করিবার পক্ষে যথেষ্ট হইবে না। যদি কেবল ভারতবর্ষের মধ্যকার সংগ্রামই স্বাধীনতা লাভের পক্ষে যথেষ্ট হইত, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই নির্ব্বোধের ন্যায় বিনা প্রয়োজনে এই বিপদের ঝুঁকি লইতাম না। আমার ভারত ত্যাগ করিবার উদ্দেশ্য, ভারতবর্ষের মধ্যে যে স্বাধীনতা সংগ্রাম চলিতেছে বাহির হইতে তাহাকে সাহায্য করা। প্রকৃতপক্ষে বহিঃসাহায্য ব্যতীত কাহারই পক্ষে ভারতকে স্বাধীন করা সম্ভব নয়। কিন্তু দেশের আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা সংগ্রামে বহিঃসাহায্য অবিলম্বে প্রয়োজন, তাহার পরিমাণ প্রকৃতপক্ষে একান্ত অল্প। কারণ চক্রশক্তির আঘাতে

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের দৃঢ় আসন টলায়মান হইয়া পড়িয়াছে; ফলে আমাদের উদ্দেশ্য পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সহজেই সাফল্যমণ্ডিত হইবে। প্রথমতঃ আমাদের দেশবাসীর অন্তরে এই বিশ্বাস জন্মাইয়া দিতে হইবে যে, একদিন তাহারা স্বাধীনতা সংগ্রামে জয়লাভ করিবেই। দ্বিতীয়তঃ, ভারতের বাহির হইতে তাহাদের সামরিক সাহায্য প্রদান করিতে হইবে। প্রথম উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে আন্তর্জ্জাতিক যুদ্ধের পরিস্থিতি বুঝিতে হইবে এবং তাহা হইতেই যুদ্ধের ফলাফল জানা যাইবে। দ্বিতীয় কাজ করিতে হইলে ভারতের বাহিরের ভারতীয়রা তাহাদের স্বদেশবাসীদিগকে কিভাবে সাহায্য করিতে পারে এবং প্রয়োজন হইলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শত্রুদের কাছ হইতেও কি সাহায্য লাভ করা সম্ভব, তাহা জানিতে হইবে। বন্ধুগণ! আমি এখন আপনাদিগকে বলিতে পারি যে, এই উভয় উদ্দেশ্যই পূর্ণ হইবে। বিদেশে ঘুরিয়া আমি সমস্ত অবস্থা দেখিয়াছি এবং যুদ্ধরত শক্তিগুলির অবস্থা জানিয়াছি। ইঙ্গমার্কিণ সাম্রাজ্যবাদ পরাজিত হইবে—ইহা বুঝিয়াই তাহা দেশে আমার স্বদেশবাসীদিগকে জানাইয়াছি। এক্সিস শক্তিরাও ভারত স্বাধীনতা লাভ করুক ইহা চাহে এবং যদি ভারতীয় জনগণ আবশ্যক বোধ করে, তবে তাহারা তাহাদের শক্তি অনুযায়ী সাহায্য করিতে প্রস্তুতও আছে। বিদেশে ভারতীয় এমন কোন নরনারী নাই, যিনি ভারতের স্বাধীনতা চাহেন না এবং জাতীয় সংগ্রামে সাহায্য করিতে প্রস্তুত নহেন। প্রচুর প্রমাণ সহ আমি বলিতে পারি যে, আমাদের দেশবাসীদের অদ্যকার এই পৃথিবীতে এক্সিস শক্তিই আমাদের বন্ধু। আমার দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে আমি কিছু করিতে পারি—একথা আমার শত্রুরাও বলিবে না। যদি ব্রিটিশ সরকার আমার নৈতিক শক্তি নষ্ট করিতে না পারিয়া

থাকে অথবা আমাকে প্রতারিত বা প্রলুব্ধ করিতে সমর্থ না হয়, তবে পৃথিবীর কোন শক্তি আমাকে প্রতারিত করিতে পারিবে না। সুতরাং আমাকে বিশ্বাস করুন স্বাধীনতা সংগ্রামে যদি বাহিরের সাহায্য আপনারা চাহেন, তবে এক্সিস শক্তির সাহায্য আপনারা পাইবেন।

যদি বাহিরের সাহায্য ব্যতীতই আপনাদের চলে, তবে তাহা ভারতের পক্ষে সবচেয়ে ভাল ব্যবস্থা। ব্রিটিশ সরকার যদি পৃথিবীর এমন কি দাসত্ব শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত, দরিদ্র, নিপীড়িত ভারতের জনগণের নিকটও ভিক্ষার ঝুলি লইয়া বাহির হইতে পারে, তবে বাহিরের নিকট হইতে সাহায্য লইতে যদি আমরা বাধ্য হই, তবে তাহা অন্যায় হইবে না।

পূর্ব্ব এশিয়ার ভারতীয়রা ভারতে ব্রিটিশ সৈন্য বাহিনীকে আক্রমণ করিবার জন্য এক শক্তিশালী সৈন্য বাহিনী গঠন করিতেছে। যখন আমরা তাহাদিগকে আক্রমণ করিব, তখন আমাদের দেশে জনগণের মধ্যেই শুধু বিপ্লব হইবে না, তখন ব্রিটিশ পতাকাতলে সমবেত ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর মধ্যেও বিপ্লবের বহ্নি জ্বলিয়া উঠিবে। যখন ব্রিটিশ সরকার এইভাবে দুইদিক অর্থাৎ ভিতর ও বাহির হইতে আক্রান্ত হইবে, তখন উহা ভাঙ্গিয়া পড়িবে এবং ভারতের জনগণ পুনরায় স্বাধীনতা ফিরিয়া পাইবে। ভারত সম্পর্কে এক্সিস শক্তির মনোভাব লইয়া মাথা ঘামাইবার কোন প্রয়োজন নাই। যদি বিদেশে ভারতীয়গণ এবং দেশে জনগণ তাহাদের কর্ত্তব্য পালন করে, তবে ব্রিটিশকে ভারত হইতে তাড়াইয়া দেওয়া ভারতীয় জনগণের পক্ষে সম্ভব হইবে এবং তাহাদের ৩৮ কোটি ৮০ লক্ষ স্বদেশবাসীকে মুক্ত করা সম্ভব হইবে।

একজাতীয় জীব আছে, যাহারা বলিবে ৩৮ কোটি ৮০ লক্ষ লোক যদি বৃটিশ শক্তিকে ভারত হইতে তাড়াইতে না পারে, তবে ত্রিশ লক্ষ ভারতীয় কি ভাবে তাহাদিগকে তাড়াইতে পারিবে? বন্ধুগণ, আয়ার্ল্যাণ্ডের ইতিহাস দেখুন, যদি ত্রিশ লক্ষ আইরিশ বৃটিশের শৃঙ্খলে সামরিক আইনের আওতায় পাচ সহস্র সিনফিন স্বেচ্ছাসেবকের সাহায্যে ১৯২১ সালে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে নতজানু হইতে বাধ্য করিতে পারে, তবে স্বদেশে শক্তিশালী আন্দোলনে সচেতন জাতির শুভেচ্ছায় পুষ্ট ত্রিশ লক্ষ ভারতীয় কেন ভারত হইতে বৃটিশকে তাড়াইতে পারিবে না?

বন্ধুগণ! পূর্ব্ব এশিয়ার ত্রিশ লক্ষ ভারতীয়ের অর্থ ও জনশক্তি দিয়া তাহাদের সমুদয় শক্তির সমাবেশ করিবার সময় আসিয়াছে। ভাসা ভাসা ব্যবস্থায় কিছুই হইবে না; আমি সমুদয় শক্তির সমাবেশ চাই। ইহার কমে চলিবে না, কারণ আমাদের শক্রুরাও বলিতেছে যে, ইহা সামগ্রিক যুদ্ধ। সামগ্রিক যুদ্ধের জন্য সামগ্রিক সমাবেশ দরকার। আমি তিন লক্ষ সৈন্য ও তিন কোটী ডলার চাই, ভারতীয় নারীদের একটা দল গঠন করিতে চাই। ভারতের ভিতরে সামগ্রিক সমাবেশের ব্যবস্থা করুন! আমি দ্বিতীয় রণাঙ্গণের প্রতিশ্রুতি দিতেছি।

৬

এই দাবী নিয়ে স্বাধীনতা দেবী আজ দ্বারে উপস্থিত

"আমাদের মাতৃভূমি বন্দিনী। মুক্তির জন্য তিনি অধীর হয়ে উঠেছেন। মুক্তি না পেলে তিনি আর বাঁচিবেন না। কিন্তু মুক্তি দেবীর বেদিতে বলি না দিলে দেবী খুসী হবেন না। তোমাদের কাছে তিনি চান অকুণ্ঠ আত্মত্যাগ। তোমাদের সকল সম্পদ, সকল

শক্তি, তোমরা যা কিছু মূল্যবান মনে কর—যা কিছু তোমাদের আছে সব তাঁর কাছে বলি দিলে তবে তাঁর ক্ষুধা মিটিবে, তিনি তুষ্ট হবেন। পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত যত বিপ্লবী জন্মেছেন তাঁদের মত তোমাদের সকল আরাম, সকল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, সকল সম্ভোগ, সকল অর্থ, সকল সম্পদ বলি দিতে হবে। রণক্ষেত্রে তোমরা তোমাদের পুত্রকে সৈনিক করে পাঠিয়েছ। কিন্তু মুক্তি দেবীর তৃষ্ণা তাতে মেটে নাই। তাঁকে তুষ্ট করার গোপন সন্ধান আমি তোমাদের দেখাব। আজ তিনি কেবলমাত্র যোদ্ধা, স্বাধীনতার ফৌজের সৈনিক পেলেই খুশী নন, আজ তিনি চান, বিদ্রোহীর দল—পুরুষ আর নারী বিদ্রোহীর দল—যারা আত্মবিলোপী বাহিনীতে যোগ দিতে প্রস্তত—যাদের কাছে মৃত্যু ধ্রুব—যে সকল বিদ্রোহী শত্রুকে রক্তের নদীতে নিমজ্জিত করিতে কৃতসংকল্প। তাদের নিজের দেহের রক্ত প্রবাহিত হ'য়ে সে রক্তের নদী সৃষ্টি হ'বে। মুক্তি দেবী এই দাবী নিয়ে আমাদের দ্বারে উপস্থিত—

তুম্ হামকো খুন দো, ম্যঁয় তুমকো আজাদী দুঙ্গা,

"আমাকে তোমরা রক্ত দাও, আমি তোমাদের মুক্তি দেব।'

[শ্রোতাদের মধ্য হইতে স্বতঃস্ফূর্ত্ত সমবেত ধ্বনি—"আমরা প্রস্তত—আমরা আমাদের রক্ত দিতে প্রস্তত—গ্রহণ করুন।"]

[—শ্রীসুভাষ, ১৯৪২ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর 'যতীন দাস দিবস' ও 'শাহীদ দিবস' উপলক্ষে বক্তৃতা]

৭

নেতাজীর স্বপ্ন

"ওরা বলে, আমি স্বপনচারী। আমি স্বীকার ক'রছি, আমি স্বপনচারীই বটে। সারাজীবন আমি স্বপ্ন দেখেছি; শিশুকাল

থেকেই এ আমার এক রোগ। কত স্বপ্নই না আমি দেখেছি। কিন্তু আমার স্বপ্নের সেরা স্বপ্ন—আমার জীবনের সব চাইতে প্রিয়স্বপ্ন —ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্ন। ওরা মনে করে, স্বপ্ন দেখাটা বুঝি একটা দোষ। আমি এতে গর্ব্ব বোধ করি। ওদের কাছে আমার স্বপ্ন ভাল লাগে না। কিন্তু সে ত নূতন কথা নয়। ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্নকে আমার জীবনে যদি একান্ত ক'রে না নিতাম তবে দাসত্বের শিকলকে শাশ্বত ব'লে আমাকে মেনে নিতে হ'ত। আসল প্রশ্ন হ'চ্ছে, আমার স্বপ্ন কি বাস্তব রূপ নিতে পারবে ? আমি বলছি, পারবে। দিনে দিনে আমার স্বপ্ন বাস্তবে বিকশিত হ'য়ে উঠছে। এই যে স্বাধীন ফৌজ গঠিত হ'ল—এ আমার একটি স্বপ্নের বাস্তব রূপ। না, স্বপনচারী হ'তে আমার লজ্জা নেই। স্বপনচারীদের স্বপ্নই পৃথিবীকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। বিশ্বের প্রগতি তাঁদের স্বপ্নের ফলে সম্ভব হয়েছে। সে স্বপ্ন অন্যকে শোষণের স্বপ্ন নয়, ব্যক্তিগত ধনসম্পদ বা সম্মান বৃদ্ধির জন্য স্বপ্ন নয়, অবিচারকে শাশ্বত করার স্বপ্ন নয়—সে স্বপ্ন প্রগতির স্বপ্ন, প্রচুরতমলোকের প্রভূততম সুখ সাধনের স্বপ্ন, সকল জাতির স্বাধীনতা মুক্তির স্বপ্ন।"

৮

আজাদ হিন্দ ফৌজের দিনপঞ্জী

৭ই ডিসেম্বর, ১৯৪১—সুদূর প্রাচ্যে যুদ্ধ আরম্ভ।

১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২—জাপান কর্তৃক সিঙ্গাপুর অধিকার।

নভেম্বর-ডিসেম্বর—পেনাংস্থ ইংরাজ ইনষ্ট্যুট এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্কট।

১৮ই এপ্রিল, ১৯৪৩—যুদ্ধের জন্য ভারতীয় স্বাধীনতা- সঙ্ঘগঠিত।

৪ঠা জুলাই, ১৯৪৩—ভারতীয় স্বাধীনতা লীগের সভাপতিপদে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু।

৫ই জুলাই, ১৯৪৩—আজাদ হিন্দ ফৌজ সংগঠিত।

২৫শে আগষ্ট, ১৯৪৩—ফৌজের সিপাহসালার পদে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু।

২১শে অক্টোবর, ১৯৪৩—আর্জ্জি হুকুমৎ-ই-আজাদ হিন্দ প্রতিষ্ঠিত।

২২শে অক্টোবর, ১৯৪৩—রাণী ঝান্সী বাহিনীর শিবির উদ্বোধন।

২৫শে অক্টোবর, ১৯৪৩—ব্রিটিশ ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা।

৮ই নভেম্বর, ১৯৪৩—আজাদ হিন্দ সরকারের হাতে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ অর্পণ।

৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৪৩—পোর্টব্লেয়ারে ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা উত্তোলন।

৮ই জানুয়ারী, ১৯৪৪—রেঙ্গুণে অগ্রবর্ত্তী প্রধান কার্য্যালয় স্থাপিত, শহীদ দ্বীপের চীফ কমিশনার পদে জেনারেল লোগনাদান।

১৮ই মার্চ্চ, ১৯৪৪—ভারতের মাটিতে আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রবেশ।

২২শে মার্চ্চ, ১৯৪৪—ইংরেজ কবলমুক্ত ভারতের প্রথম গভর্ণর পদে কর্ণেল চ্যাটার্জ্জি।

৪ঠা জুলাই, ১৯৪৪—'নেতাজী সপ্তাহে'র আরম্ভ।

২১শে আগষ্ট, ১৯৪৪—প্রবল বর্ষাপাতের জন্য সামরিক কার্য্যকলাপ স্থগিত।

ডিসেম্বর-জানুয়ারী, ১৯৪৪-৪৫—ফৌজের দ্বিতীয় অভিযান।

৩রা মে, ১৯৪৫—ব্রিটিশের নিকট আজাদ হিন্দ ফৌজের আত্মসমর্পণ।

৯

অন্তর্দ্ধানের গুপ্ততথ্য

১৯৪০ খৃষ্টাব্দে ফরাসীর আত্মসমর্পণের সময় রুশ সরকার কংগ্রেসের নিকট ভারতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য সমরোপকরণ ও অর্থ সরবরাহ করিবার সম্মতি জানাইয়া প্রস্তাব পাঠায়। রুশ গভর্ণমেণ্ট আরও জানায় যে ভারতব্যাপী বিদ্রোহ সম্যক বিস্তৃতি লাভ করিলে কংগ্রেসের আবেদনে রুশ ইংরাজকে ভারত হইতে বিতাড়নে সামরিক সাহায্য করিবে এইরূপ প্রস্তাবও করে। কংগ্রেস এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে কিন্তু সুভাষচন্দ্র ইহার সুযোগ গ্রহণে কৃতসংকল্প হইলেন। সুভাষচন্দ্র ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে অন্তর্দ্ধানের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থকাম হন। সাংবাদিক নিরঞ্জন সিংহের চেষ্টায় কমুনিষ্ট নেতা সর্দ্দার ইচ্ছর সিংহের সহিত সুভাষচন্দ্র সাক্ষাৎ করেন এবং গোপণে রাশিয়ায় যাওয়ার সাব্যস্ত হয়। পাঞ্জাব কমুনিষ্টদল বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ আলোচনায় তাঁহার নিরাপদে পলায়নের ব্যবস্থা করিতে সম্মত হন। তাঁহার অসুস্থতার জন্য ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে ২৬শে জানুয়ারীতে অন্যতম মন্ত্রীর সাহায্যে কলিকাতা হইতে মোটর যোগে বর্দ্ধমান যাইয়া পাঞ্জাব মেল ধরেন। তাঁহার পূর্ব্বাহ্নেই এই গাড়ীর দ্বিতীয় শ্রেণীর এক কামরা রিজার্ভ করা ছিল। ঐ সময় তাঁহার বড় বড় গোফ, চুল ও শ্মশ্রু ছিল। এইভাবে তিনি পাঞ্জাবে পৌছিয়া তথা হইতে পেশোয়ারে যান, তথায় আব্বাস খাঁয়ের অতিথিরূপে তিন দিন কাটান। তারপর ব্যবস্থা মত নেতাজী একজন দেহরক্ষী সহ একখানি পেশোয়ারী টোঙ্গায় করিয়া পেশোয়ার হইতে পাঁচ মাইল পথ যাইবার পর পদব্রজে কাবুল যান। কিন্তু কাবুলে অবস্থান কালে কমুনিষ্টগণ তাঁহার প্রতি অসদাচরণ

করে। নেতাজী রোগে আক্রান্ত অবস্থায় জনৈক গোয়েন্দার নজরে পড়েন তবে একখানা দশ টাকার নোট ও একটি ফাউনপেন দিয়া উদ্ধার পান। কিন্তু এই সময় তাঁহার এক নূতন বিপদ উপস্থিত হইল। এই সময় সোভিয়েট-জার্মান চুক্তি ভঙ্গ হয় এবং ইঙ্গ-রুশ চুক্তি সম্পাদিত হওয়ায় রুশ সরকার তাঁহাকে রুশিয়ায় স্থান দিতে অস্বীকার করে। তথাকার একজন জার্মান নেতাজীকে বিমান যোগে রুশিয়ার পথে বার্লিনে পাঠান।

ভারতে অন্তর্বিপ্লব

[আগষ্ট আন্দোলন]

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই তারিখে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বিখ্যাত "ভারত ছাড়" প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এই প্রস্তাব ৮ই আগষ্ট নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিতে গৃহীত হয় এই প্রস্তাবে বৃটিশকে ভারত ছাড়িয়া যাইতে অনুরোধ করা হয়। গান্ধীজী অহিংস উপায়ে এই আন্দোলনে সকলকে যোগদান করিতে বলেন। তাঁহার বাণীতে তিনি বলেন" অহিংস উপায়ে প্রত্যেক লোকের স্বীয় কার্য্যের সম্পূর্ণ অবসান ঘটান অথবা ধর্ম্মঘট চালাইবার স্বাধীনতা আছে।……যখন ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকে মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে পরিবে জাতি তখনই বাঁচিতে পারে"। তিনি বাণী দেন "**হয় কর না হয় মর, করেঙ্গে য়্যা মরেঙ্গে।**" নিম্নে এই ঐতিহাসিক প্রস্তাবের সারমর্ম্ম দেওয়া হইল। নেতাজী ত্রিপুরী কংগ্রেসে ইংরেজকে ছয় মাসের চরম পত্র দিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিতে চাহেন কিন্তু মহাত্মা চালিত কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষ সেই প্রস্তাবে রাজী হন না। আজ কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষের শুভবুদ্ধির উদয়

হইয়াছে। নেতাজীই প্রকৃত প্রস্তাবে এই প্রস্তাবের জনক। "ভারত ছাড়" এই দুইটি ঐন্দ্রজালিক শব্দে আসমুদ্রহিমাচলে ভারতবর্ষ চঞ্চল হইয়া উঠে। ভারতের ভিতরে অন্তর্বিপ্লব দেখা দেয় এবং ভারতের বাহিরে নেতাজীর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ বাহিনী এই প্রস্তাবের বাস্তব রূপ দিতে চেষ্টা করে।

ঐতিহাসিক আগষ্ট প্রস্তাব

(নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিতে যে আকারে গৃহীত হয়)

ওয়ার্কিং কমিটির ১৯৪২ সালের ১৪ই জুলাই এর প্রস্তাব নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি অনুমোদন ও সমর্থন করিতেছে।···ভারতবর্ষের জন্য এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্যকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য **ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের অবসান অবিলম্বে প্রয়োজন। ব্রিটিশ শাসন ভারতকে পঙ্গু করিয়া তাহার অবনতি ঘটাইতেছে।** ইহার ফলে ভারতবর্ষের আত্মরক্ষার ও বিশ্বের মুক্তি সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে।

স্বাধীনতা অপেক্ষা পরাধীন ও ঔপনিবেশিক দেশগুলির উপর আধিপত্য স্থাপন এবং ধনতান্ত্রিক প্রথা ও উপায়কে কায়েম করিবার চেষ্টার উপরই মিত্রপক্ষীয় জাতিপুঞ্জের নীতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। সাম্রাজ্যের অধিকার ইংরেজকে শক্তি দান করে নাই বরং উহা অভিশাপ স্বরূপ হইয়াছে। আধুনিক সাম্রাজ্য বাদের চরম নিদর্শন ভারতবর্ষ সমস্ত প্রশ্নের জটিল গ্রন্থি স্বরূপ কারণ ভারতের স্বাধীনতার মাপকাঠিতেই ব্রিটেন ও মিত্রজাতিগুলিকে পরিমাপ করিতে হইবে। ভারতের স্বাধীনতা, এশিয়া ও আফ্রিকার জনগণের মনে আশা ও উৎসাহ আনিবে।

সুতরাং বর্ত্তমান বিপদের দিনে (যুদ্ধের সময়ে) ভারতের স্বাধীনতা এবং ভারতে ব্রিটিশ প্রভুত্বের অবসান অত্যাবশ্যক। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন আশ্বাস বা নিশ্চয়তা দ্বারা বর্ত্তমান সমস্যার সমাধান হইবে না বা বর্ত্তমান বিপদের প্রতিকার হইবে না। লক্ষ লক্ষ লোকের যে প্রেরণা ও শক্তি অবিলম্বে যুদ্ধের প্রকৃতি পরিবর্ত্তন করিতে পারে, জনগণ একমাত্র এখনই স্বাধীনতা লাভ করিলেই সে শক্তি স্ফুরিত হইতে পারে।

সুতরাং ভারত হইতে বৃটিশ শক্তি অপসারণের জন্য যে দাবী করা হইয়াছে, নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি পূর্ণ গুরুত্ব আরোপ করিয়া উহা পুনরুত্থাপন করিতেছে। ভারতের স্বাধীনতা ঘোষিত হইলে এক সাময়িক গভর্ণমেণ্ট গঠন করা হইবে এবং স্বতন্ত্র ভারত সম্মিলিত জাতিসমূহের মিত্ররাষ্ট্রে পরিণত হইয়া স্বাধীনতার সংগ্রাম প্রচেষ্টায় তাহাদের সুখ দুঃখের সমান অংশীদার হইবে। একমাত্র এ দেশের প্রধান পার্টি ও দলগুলির সহযোগীতায়ই সাময়িক গভর্ণমেণ্ট গঠিত হইতে পারে। সুতরাং ভারতের জনগণের গুরুত্বপূর্ণ অংশ সমূহের প্রতিনিধিদের লইয়া এই গভর্ণমেণ্ট গঠিত হইবে ও তাহা মিশ্র গভর্ণমেণ্ট হইবে। গভর্ণমেণ্টের প্রথম কার্য্য হইবে দেশ রক্ষার ব্যবস্থা করা এবং মিত্রশক্তিবর্গের সহিত সহযোগীতায় সর্ব্বপ্রকারের হিংস ও অহিংস উপায়ে শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করা। ক্ষেত্রে, কারখানায় এবং অন্যান্য স্থানে যাহারা পরিশ্রম করে, মূলতঃ সশস্ত্র ক্ষমতা ও অধিকার তাহাদেরই হইবে এবং সাময়িক গভর্ণমেণ্ট ইহাদের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করিবেন।

গণপরিষদ গঠনের উদ্দেশ্যে, সাময়িক গভর্ণমেণ্ট একটি পরিকল্পনা স্থির করিবেন এবং সেই গণপরিষদ ভারত শাসনের জন্য সকল শ্রেণীর

গ্রহণযোগ্য একটি শাসনতন্ত্র প্রস্তুত করিবেন। কংগ্রেসের মতানুসারে সেই শাসনতন্ত্র যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র হইবে। যে সকল রাষ্ট্র লইয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইবে, তাহাদিগকে যত অধিক সম্ভব স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতা দেওয়া হইবে। কেন্দ্রে ক্ষমতা হস্তান্তরের পর যাহা অবশিষ্ট থাকিবে যে সকল রাষ্ট্র লইয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইবে, সেই ক্ষমতা সেই সকল রাষ্ট্রে বর্ত্তিবে। পারস্পরিক সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এবং আক্রমণ প্রতিরোধরূপ সাধারণ কর্ত্তব্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে পরস্পর সহযোগিতা করিবার জন্য ঐ সকল স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ সম্মিলিত আলোচনার দ্বারা ভারতের সহিত সম্মিলিত জাতিসমূহের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধের বিষয় স্থির করিবেন। স্বাধীনতা লাভ করিলে ভারত জনসাধারণের সম্মিলিত ইচ্ছা ও শক্তি দ্বারা পুষ্ট হইয়া, কার্য্যকরীভাবে আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইবে।

ভারতের স্বাধীনতা এশিয়ার বৈদেশিক শাসনাধীন অন্যান্য সকল জাতীর স্বাধীনতার প্রতীক এবং অগ্রদূত হইবে। ব্রহ্ম, মালয়, ইন্দোচীন, ডাচ ইণ্ডিজ, ইরাণ ও ইরাক অবশ্যই পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিবে।

বর্ত্তমান সঙ্কট মুহূর্ত্তে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি প্রধানতঃ ভারতের স্বাধীনতার এবং ভারতরক্ষার সহিতই সংশ্লিষ্ট। কিন্তু কমিটির অভিমত এই যে, জগতের ভবিষ্যৎ শান্তি, নিরাপত্তা এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ উন্নতির জন্য বিশ্বের স্বাধীন জাতিসমূহের মৈত্রীবন্ধন একান্ত প্রয়োজন। এতদ্ভিন্ন অন্য কোনও ভিত্তিতে আধুনিক জগতের সমস্যাসমূহের সমাধান হওয়া সম্ভবপর নহে। এই ধরণের বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘ গঠিত হইলে, যাহাদের দ্বারা সঙ্ঘ গঠিত, সেই সকল জাতীর স্বাধীনতা নিরাপদ হইবে। বিশ্বরাষ্ট্র আক্রমণ প্রতিরোধ, এক জাতি কর্ত্তৃক অন্য

জাতিকে শোষণ, সংখ্যালঘিষ্ঠদিগের সংরক্ষণ, অনগ্রসর অঞ্চল ও অধিবাসীদিগের উন্নতিবিধান এবং সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলের জন্য জগতের ঐশ্বর্য্য আহরণ করিবে। এইরূপ বিশ্বরাষ্ট্র গঠিত হইলে কোন দেশেই সৈন্য দরকার হইবে না। একটি বিশ্বরাষ্ট্র বাহিনী পৃথিবীর শান্তি রক্ষা করিবে।

এইরূপ বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘে স্বাধীন ভারত সানন্দে যোগদান করিবে এবং আন্তর্জাতিক সমস্যাবলীর সমাধানে সমমর্য্যাদার ভিত্তিতে অন্যান্য দেশের সহিত সহযোগিতা করিবে।

যে সকল জাতি ফেডারেশনের মূলনীতিতে বিশ্বাসী হইবেন, তাঁহাদের সকলেরই উহাতে যোগদানের অধিকার থাকিবে; কিন্তু বর্ত্তমানে যুদ্ধের অবস্থা বিবেচনায় প্রারম্ভে মাত্র সম্মিলিত জাতি-সমূহ লইয়া এই ফেডারেশন গঠিত হইবে। বর্ত্তমানে এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইলে যুদ্ধের উপর, এক্সিসপক্ষীয় রাষ্ট্রসমূহের জনগণের উপর এবং ভবিষ্যতে যে শান্তি স্থাপিত হইবে তাহার উপর উহার বিশেষ ফল হইবে।

ভারতের স্বাধীনতার দাবী উত্থাপিত হইলেও পরিষ্কার দেখা যায়, এই দাবী সম্পর্কে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রতিক্রিয়া, বৈদেশিক সংবাদ পত্রসমূহের বিপথ চালিত সমালোচনাবলী ভারতের দাবীর বিরোধিতা করিতেছে।

বৈদেশিক মহলে ওয়ার্কিং কমিটির আবেদনের যে সমালোচনা করা হইয়াছে, উহা হইতে ভারত ও পৃথিবীর প্রয়োজন সম্পর্কে তাঁহাদের অজ্ঞতা প্রকাশ পাইয়াছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ভারতের স্বাধীনতার দাবী সম্পর্কে তাঁহাদের বিরুদ্ধতার মনোভাবও প্রকাশ পাইয়াছে। এই সমস্ত বৈদেশিকদের প্রভুত্ব করার মনোভাব

জাতিগত শ্রেষ্ঠতার মনোভাবেরই নিদর্শন। রাষ্ট্রীয় সমিতি জাতিকে আর বাধাদান করিতে পারেন না। সুতরাং গত ২২ বৎসর শান্তিপূর্ণ সংগ্রামের ভিতর দিয়া দেশ যে অহিংসা শক্তি অর্জ্জন করিয়াছে, দেশ যাহাতে সমগ্রভাবে সেই শক্তি প্রয়োগ করিতে পারে, তজ্জন্য নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয়সমিতি, স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীনতায় ভারতবর্ষের যে অবিচ্ছেদ্য অধিকার রহিয়াছে সেই অধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে অহিংস পন্থায় যথাসম্ভব ব্যাপকভাবে গণ-আন্দোলন প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব অনুমোদন করিতেছেন। এই সংগ্রাম অনিবার্য্যরূপে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত হইবে এবং নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি তাঁহাকে নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে এবং যে সমস্ত পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে, সেই সমস্ত পন্থায় জাতিকে পরিচালিত করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিতেছে।

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি ভারতবর্ষের জনসাধারণের ভাগ্যে যে সমস্ত বিপদ এবং দুঃখকষ্ট ঘটিবে, তাঁহাদিগকে সেই সমস্ত বিষয় এবং দুঃখকষ্টের সম্মুখীন হইবার, গান্ধীজীর নেতৃত্বে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া থাকিবার এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের শৃঙ্খলপরায়ণ সৈনিক হিসাবে তাঁহার (গান্ধীজীর) নির্দ্দেশ পালন করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছে। তাঁহাদিগকে অবশ্যই এই কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অহিংসাই এই আলোন্দালনের ভিত্তি। এমন সময় আসিতে পারে যখন আর আমাদের জনগণের নিকট নির্দ্দেশ পৌছাইয়া দেওয়া সম্ভবপর হইবে না এবং কোন কোন কংগ্রেসকমিটি কাজ চালাইতে পারিবে না। যখন এইরূপ অবস্থা ঘটিবে তখন যে সমস্ত নরনারী এই আন্দোলনে যোগদান করিবেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেই সাধারণ নির্দ্দেশাবলীর গণ্ডির ভিতরে থাকিয়া নিজ নিজ কাজ চালাইয়া যাইবেন। স্বাধীনতাকামী এবং স্বাধীনতা লাভের চেষ্টায় তৎপর

প্রত্যেক ভারতবাসীকে তাঁহার নিজের পথপ্রদর্শক হইয়া যে বন্ধুর পথের কোথাও বিশ্রামের স্থান নাই এবং ভারতবর্ষের মুক্তি এবং স্বাধীনতা অর্জ্জনের পর যে পথের অবসান হইয়াছে সেই পথ দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে।

স্বাধীন ভারতবর্ষের ভারত-শাসন-ব্যবস্থা কিরূপে হইবে সে সম্বন্ধে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি তাহার নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করিবার পর উপসংহারে সুস্পষ্টভাবে সকলকে এই কথা জানাইয়া দিতে চাহেন যে, গণ-আন্দোলন আরম্ভ করিয়া ইহার কংগ্রেসের জন্য ক্ষমতা লাভ করিবার কোন উদ্দেশ্য নাই। ক্ষমতা যখন হস্তগত হইবে, তখন ইহা ভারতবর্ষের সমস্ত জনসাধারণের হাতেই থাকিবে।"

এই প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর ৯ই আগষ্ট সরকার বাহাদুর মহাত্মা গান্ধীকে, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ও সদস্যগণকে এবং প্রত্যেক প্রদেশের বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তার করে। সমগ্র ভারতে সমস্ত কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানগুলিকে বে-আইনী ঘোষণা করা হয়। ইহার ফলে সমস্ত দেশব্যাপী এক বিরাট আন্তর্বিপ্লব দেখা দেয়। সিপাহী বিদ্রোহের পর এইরূপ ব্যাপক বিদ্রোহ ভারতে আর হয় নাই। এই বিপ্লবের কোন নেতা ছিল না, কোন পরিকল্পনা বা নির্দ্দেশ ছিল না, ইহাতে কোন সৈন্য ছিল না, কোন অস্ত্রশস্ত্র ছিল না। ইহা **স্বতঃ স্ফূর্ত্ত গণ-আন্দোলন।** বহুলোক এই আন্দোলনে স্বেচ্ছায় যোগদান করে। মনে রাখিতে হইবে প্রথমে জনসাধারণ অহিংস উপায়ে "ভারত ছাড়" আন্দোলন করে। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট অহিংস আন্দোলনকে হিংস উপায়ে প্রতিরোধ করেন। তখন জনসাধারণ অহিংস উপায় পরিত্যাগ করিয়া স্থানে স্থানে হিংস উপায় অবলম্বন করে। ভারতের বহুস্থানে রেলওয়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। টেলিগ্রাফের টেলিফোনের ও বৈদ্যুতিক

আলোর তার কাটিয়া দেওয়া হয়। বহু পোষ্টাফিস ও থানা পুড়াইয়া দেওয়া হয়, আক্রান্ত বা লুণ্ঠিত হয়, রাস্তাসমূহের ক্ষতিসাধন করিয়া অচল করা হয়। বড় বড় সহরে ট্রামগাড়ী মটর ট্রাকে পোড়াইয়া দেওয়া হয়। নেতৃবর্গের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে দোকানপাট্ স্কুল কলেজ কলকারখানা বন্ধ হয়। ছাত্র ছাত্রী স্কুল কলেজ ছাড়িয়া দিনের পর দিন এই আন্দোলনে যোগ দেয়। চাষী, মজুর, কাজ ছাড়িয়া দলে দলে "ইংরাজ ভারত ছাড়" "কর না হয় মর" এই ধ্বনি করিয়া আকাশ বাতাস মুখরিত করে। বড় বড় কলকারখানায় ধর্ম্মঘট হইয়াছিল। আইনের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়া ছোট বড় শোভাযাত্রা বাহির করা হইয়াছিল। কয়েক জায়গার কোর্টে, পোষ্টাফিসে ও রেল ষ্টেশনে হানা দিয়া কাগজ পত্র পোড়াইয়া দেওয়া হয়। কয়েক স্থানে রেলপথের ক্ষতি করিয়া ট্রেণ চলাচল বন্ধ হয়। অনেক জায়গায় ইউনিয়ন বোর্ড অফিস, আফগারি দোকান, হাইস্কুল, আয়কর অফিস, রেলওয়ে ষ্টেশন আগুন দিয়া পোড়াইয়া দেওয়া হয়। কয়েকখানি ট্রেণও আগুণে পোড়াইয়া দেওয়া হয়। কয়েকজন পুলিশ অফিসার, কনেষ্টবল ও হাকিম নিহত হয়। এই সকল কার্য্যের প্রতিরোধের জন্য সরকার বাহাদুর অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছিলেন। পুলিশ অনেক সভা ও শোভাযাত্রায় লাঠি চালাইয়া ছত্রভঙ্গ করে। অনেক স্থলে পুলিশ ও মিলিটারী গুলি চালায়, ইহাতে বহুলোক নিহত ও আহত হয়। পুলিশ অনেক স্থলে দলপতিদের ঘরে আগুন দিয়া পোড়াইয়া দেয়। সরকারের হিসাবে দেখা যায়—৯৪০ জন নিহত, ১৬০০০ হাজার আহত হয়, পুলিশ ৪৭০ জায়গায় গুলি চালায়, ৬০২২৯ জন লোক গ্রেপ্তার হয়, বহু গ্রাম আগুন লাগাইয়া পোড়াইয়া দেওয়া এবং লোকের বাসভূমি লাঙ্গল দিয়া চাষ হয়।

বাংলার হলদিঘাট—মেদিনীপুর

আগষ্ট আন্দোলনের ইতিহাসে তেজস্বী দেশপ্রেমিক দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথের কর্ম্মভূমি মেদিনীপুর একটী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। মেদিনীপুরের বিশেষতঃ তমলুক ও কাঁথি মহকুমায় আন্দোলন এমন ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া পড়ে যে কয়েক মাসের মধ্যে কয়েকটী স্থানে কয়েক মাসের জন্য বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটে এবং **জাতীয় গভর্ণমেণ্ট** প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দুই মহকুমায় ঝঞ্ঝা ও প্লাবণ, মহামারী ও দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে বিধ্বস্ত হইলেও মহকুমা বাসীগণ মহাত্মাজীর আহ্বানে একপ্রাণ হইয়া অভূতপূর্ব্ব সাড়া দেয়। ভারতের আর কোথাও এত ব্যাপকভাবে আগষ্ট আন্দোলন সাফল্য লাভ করে নাই।

তমলুক মহকুমা

তমলুক—মেদিনীপুর জেলার একটী মহকুমা। উহার এলাকায় ছয়টী থানা আছে। যথা:—সুতাহাটা, নন্দিগ্রাম, মহিষাদল, তমলুক ময়না ও পাঁশকুড়া। এই মহকুমার মধ্যে কেবল তমলুক সহরেই মিউনিসিপ্যালিটী আছে। সহরের লোক সংখ্যা ১২ হাজার। তমলুক মহকুমায় ৭৬টী ইউনিয়ন আছে এবং ১২৪৬টী গ্রাম আছে। সমগ্র মহকুমায় ১,৪২,২০০টী পরিবারে মোট ৭,৫৩,১৫২জন লোক বাস করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার বহুপূর্ব্বে মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেস কমিটীর অধীনে তমলুকে একটী মহকুমা কংগ্রেস কমিটী ও ছয়টী থানা কংগ্রেস কমিটী ছিল। প্রাথমিক কংগ্রেস কমিটীগুলি প্রতিটী ইউনিয়নে স্থাপিত ছিল। ৪টী থানা কংগ্রেস কমিটীর নিজস্ব

অফিস ঘর ছিল। অপর দুইটী থানা কংগ্রেস কমিটীর কার্য্যালয় ভাড়া করা বাড়ীতে ছিল।

আগষ্ট আন্দোলনের পর তমলুক মহকুমায় দুই বৎসর যাবৎ জাতীয় গভর্ণমেণ্ট (**জাতীয় সরকার**) প্রতিষ্ঠিত ছিল। ১৯৪২সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর রাত্রিতে তমলুক ও কাঁথি মহকুমার যোগাযোগ রক্ষার ব্যবস্থার শতকরা প্রায় ৯০ভাগ বিনষ্ট করা হইয়াছিল, এবং পরের দিন শুধু তমলুক মহকুমায় ৪০হাজার নিরস্ত্র ও অহিংসা জনতা আক্রমণ চালাইবার জন্য কয়েকটী থানায় সমবেত হয়।

জাতীয় গভর্ণমেণ্টের কার্য্যকলাপ প্রধাণতঃ সুতাহাটা, নন্দীগ্রাম মহিষাদল এবং তমলুক এই ৪টী থানার ভিতর সীমাবদ্ধ ছিল। এই ৪টী থানা দখলের জন্য ৭বার আক্রমণ করা হইয়াছিল।

যাতায়াত ও যোগাযোগ রক্ষার ব্যবস্থা বিপর্য্যস্ত করিবার জন্য যে সংগ্রাম আরম্ভ করা হইয়াছিল তাহার ফলে ৩০টী সেতু ধ্বংস করা হয়, ২৭মাইল লম্বা টেলিগ্রাফের তার কাটা হয়, ১৯৪টী টেলিগ্রাফের থাম ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়, এবং গাছ ফেলিয়া ৪৭টী রাস্তা অবরুদ্ধ করা হয়।

যে সমস্ত স্থান দখল করিয়া রাখা যায় নাই, সে সমস্ত স্থান সম্পর্কে "পোড়া মাটীর" নীতি অনুসরণ করা হয়। ইহার ফলে নিম্নলিখিত প্রকারের "শত্রু শিবির" গুলি ভস্মীভূত হয়। ২টী থানা ২টী সাব রেজেষ্ট্রী অফিস, ১৩টী ডাকঘর, ১টী খাস মহল অফিস, ১৭টী আবগারী দোকান এবং ১২টী ডাক বাংলা, এতদ্ব্যতীত ২৪টী জমিদারী কাছারী ১৬টী পঞ্চায়েত বোর্ড ৯টী ইউনিয়ন বোর্ড এবং জেলা বোর্ডের ১৭টী অফিসও ভস্মীভূত হয়।

১৩জন গভর্ণমেণ্ট অফিসারকে গ্রেপ্তার করিয়া পরে ছাড়িয়া

দেওয়া হয়। ধৃত সরকারী কর্মচারীদের উপর খুব সদয় ব্যবহার করা হয় এবং বাড়ীতে ফিরিয়া যাইবার জন্য তাঁহাদিগকে পথ খরচ দেওয়া হয়। সুতাহাটা থানা দখলের সময় ৬টী বন্দুক ও ২খানি তরবারি হস্তগত করা হইয়াছিল; কিন্তু ঐ সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র কখন ও ব্যবহার করা হয় নাই। এইগুলি নষ্ট করিয়া ফেলা হয়।

১৯৪২সালে ৭ই ডিসেম্বর তারিখে জনসাধারণ তমলুক মহকুমায় একটী **'তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার'** নামে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত করেন। এই গভর্ণমেণ্টের অধীনে তাঁহাদের নিজেদের ৫টী থানা অফিস এবং ৬টী ইউনিয়ন পঞ্চায়েত অফিসও ছিল।

মহকুমা কংগ্রেস কমিটী কর্ত্তৃক নিয়োজিত একজন ডিক্টেটর তমলুক মহকুমা জাতীয় গভর্ণমেণ্টের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা (ডিক্টেটর) হন। ডিরেক্টর তাঁহার পরবর্ত্তী ডিরেক্টরকে মনোনীত করিতে পারিতেন। এই মনোনয়ন মহকুমা কংগ্রেস কমিটীর অনুমোদন সাপেক্ষ ছিল। তমলুক মহকুমায় একাদিক্রমে ৪জন ডিক্টেটর নিযুক্ত হইয়াছিল। চতুর্থ ডিক্টেটর মহাত্মাজীর নির্দ্দেশক্রমে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের নিকট আত্ম সমর্পণ করেন।

একটী মন্ত্রীসভার সাহায্যে ডিক্টেটর জাতীয় গভর্ণমেণ্টের কাজ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেন। মন্ত্রিসভা এবং ডিক্টেটর মহকুমা কংগ্রেস কমিটীর নিকট দায়ী ছিলেন। মন্ত্রিসভার সমর, স্বরাষ্ট্র, প্রচার, শিক্ষা, অর্থ, বিচার, সাহায্য ও পুনর্গঠন প্রভৃতি কয়েকটী দপ্তর ছিল।

জাতীয় গভর্ণমেণ্টের বিচারালয় (কোর্ট) ছিল। লোকে মামলা মোকর্দ্দমা করিতে ইংরাজদের আদালতে যাইত না। জাতীয় গভর্ণমেণ্টের আপীল কোর্ট পর্য্যন্ত ছিল। জাতীয় গভর্ণমেণ্টের রেজিষ্ট্রী অফিস ছিল। মামলার সাধারণ ফি ১৲ টাকা ও জরুরী ফি ২৲

টাকা ছিল। জাতীয় গভর্ণমেণ্টের বিচারালয় সমূহে ২৯০৭টী মামলা দায়ের করা হইয়াছিল। তন্মধ্যে ১৮৮১টী মামলা নিষ্পত্তি করা হইয়াছিল। জাতীয় গভর্ণমেণ্ট ২৫১টী স্থানে খানাতল্লাসী করিয়াছিলেন। ২৭৮জন লোককে গ্রেপ্তার করিয়া মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল। জাতীয় গভর্ণমেণ্টের বিচারালয়গুলি ৫২৩জন লোককে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া তাহাদের নিকট হইতে মোট ৩৩৯৩৭৸৶০ জরিমানা আদায় করিয়াছিলেন। অন্যান্য শাস্তির মধ্যে বেত্রাঘাত আসামীকে সাবধান করিয়া দেওয়া এবং আদালতের কাজ না শেষ হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদিগকে আটক করিয়া রাখার ব্যবস্থা বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল। জরিমানা হিসাবে যে টাকা আদায় করা হইত তাহা সাহায্য বিতরণের কার্য্যে ব্যয় করা হইত।

সমর বিভাগ, বিচারকার্য্য পরিচালনা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও অবাধ্য লোকদিগকে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট মানিতে বাধ্য করার জন্য এবং জাতীয় গভর্ণমেণ্ট পরিচালনার জন্য **বিদ্যুৎ বাহিনী** নামে একটী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ছিল।

জাতীয় গভর্ণমেণ্টের প্রচার বিভাগ হইতে "বিপ্লবী" নামে সাইক্লোষ্টাইলে ছাপা একটী বুলেটিন জাতীয় গভর্ণমেণ্টের কার্য্যকলাপ সহ রীতিমত বাহির হইত, এবং নিজেদের ডাক বিভাগ ও পোষ্ট অফিস ছিল। ঝড়ের পরে এবং দুর্ভিক্ষের সময় জাতীয় গভর্ণমেণ্টের সাহায্য বিভাগ হইতে সাহায্য দান করিতে আরম্ভ করেন। অভাব গ্রস্থ লোকদিগকে খাদ্যদ্রব্য, বস্ত্র, ঔষধ, পথ্য এবং দুগ্ধ দান করা হইত, সাহায্য কার্য্যে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট মোট ১৫৮৮৪৫।৶৩পাই ব্যয় করিয়াছিলেন।

জাতীয় অভ্যুত্থানকে ইংরাজেরা কখনও ভালোর চোখে দেখিতে

পারে না। ফলে আরম্ভ হইল নিদারুণ অত্যাচার। মোটামুটি ক্ষতির বিবরণ দেওয়া হইল। ১৯৪২সালের আগষ্ট হইতে ১৯৪৪ সালের আগষ্ট মাসের মধ্যে পুলিশ ও সৈন্যদল মোট ২২টী স্থানে গুলি চালাইয়া ৪৪জনকে নিহত, ১৯৯জনকে আহত এবং ১৪২জনকে সামান্য আহত করিয়াছিল। এই সময়ের মধ্যে ৭৩জন স্ত্রীলোকের উপর পাশবিক অত্যাচার করা হয়। এতদ্ব্যতীত ৩১জন স্ত্রীলোকের উপর পাশবিক অত্যাচারের চেষ্টা করা হয় এবং ১৫০জন স্ত্রীলোককে প্রহার ও শ্লীলতা হানী করা হয়। ৫০৭৬জন লোককে "বে আইন ভাবে" আটক করিয়া রাখা হয়। এতদ্ব্যতীত ৯জন লোককে ভারত রক্ষা নিয়মাবলী অনুসারে আটক রাখা হয়, এবং ৪০১জন লোককে স্পেশাল কনেষ্টবল হিসাবে কাজ করিবার জন্য নিযুক্ত করা হয়। পুলিশ ও সৈন্যদল ১২৪টী গৃহস্থের বাড়ী ভস্মীভূত করে এই সমস্ত অগ্নিকাণ্ডের ফলে ১,৩৯,৫০০৲টাকা ক্ষতি হইয়াছে। ইহা ছাড়া ৪৯ খানা বাড়ী ভাঙ্গিয়া ৮০৫৭৲টাকা ক্ষতি করা হইয়াছে। ১০৪৪খানা বাড়ী হইতে ২,১২,৭৯৫৲টাকা মূল্যের সম্পত্তি লুণ্ঠিত হইয়াছিল ১৩৭৩০ খানি বাড়ীতে তল্লাসী করা হয় এবং ২৭খানি বাড়ী দখল করা করা হইয়াছিল। মোট ৫৯টী পরিবারের ২৫,৩৬৫৲টাকা মূল্যের সম্পত্তি ক্রোক করা হইয়াছিল। ৪২টী ইউনিয়নে মোট ১,৯০,০০০৲টাকা পাইকারী জরিমানা ধার্য্য করা হয়।

গভর্ণমেণ্ট ২২টী প্রতিষ্ঠানকে বে-আইনি বলিয়া ঘোষণা করেন। অহিংস বিদ্রোহীগণ সুতাহাটা থানা অধিকার করিলে সরকারী বিমান সমূহ হইতে তাহাদের উপর বোমা বর্ষণ করা হয়।

যাঁহারা মারা গিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ৭৩ বৎসর বয়স্কা শ্রীযুক্তা মাতঙ্গিনী হাজরা নামে মহিয়সী মহিলা ছিলেন। ইনি

বহুবৎসর যাবৎ কংগ্রেস কর্ম্মী হিসাবে কাজ করিতেছিলেন। তমলুক সহরে 'বানপুকুর' পাড়ে শোভাযাত্রা পরিচালনা করিবার সময় তাঁহার উপর তিনবার গুলি বর্ষণ করা হইয়াছিল। ১২ হইতে ১৬ বৎসর বয়স্ক ৬টী বালক ও নিহত হইয়াছিল। একটী শিশুর একখানি পা বুট জুতার নিষ্পেষণে চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

পেট্রোল এবং কেরোসিন সহযোগে চালাঘর ও ইমারত সমূহেও অগ্নিসংযোগ করা হইয়াছিল। একজন বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্ম্মীর বাড়ীতে ৫টী গরু সমেত মোট ১২টী গৃহপালিত পশু জীবন্ত অবস্থায় দগ্ধ হইয়া মারা যায়। ধৃতব্যক্তিগণকে ২ ঘণ্টা হইতে ৩ দিন পর্য্যন্ত আটক করিয়া রাখা হয়। আটক থাকা কালে তাহাদিগকে নির্ম্মমভাবে প্রহার করা হয়। ঐ সময়ে তাহাদিগকে কিছু খাইতে দেওয়া হইত না। তমলুক সাব জেলে সাধারণতঃ যত কয়েদী রাখা হয় ঐ সময়ে তাহার চতুর্গুণ লোক রাখা হইয়াছিল। ইহার প্রতিবাদ কল্পে আটক ব্যক্তিদের মধ্যে একব্যক্তি ২০দিন পর্য্যন্ত অনশন ধর্ম্মঘট করিয়াছিলেন।

অমানুষিক নির্য্যাতনের মধ্যে বহু গ্রামবাসীকে দীর্ঘ পথ ভ্রমণ করিতে বাধ্য করা হয়। তাহাদের খাইতে দেওয়া হয় নাই। দুরন্ত শীতের রাতে অধিবাসীদের পুষ্করিণীর শীতল জলে ডুবাইয়া রাখা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে তাহাদের উলঙ্গ করিয়া পুষ্করিণীতে রাখা হইয়াছিল। বহু ব্যক্তিকে এমনভাবে প্রহার করা হয় যে যে পর্য্যন্ত তাহারা অজ্ঞান না হইয়া পড়িয়াছেন সে পর্য্যন্ত তাহাদের প্রহার বন্ধ করা হয় নাই। বহু ব্যক্তিকে এমনভাবে প্রহার করা হইয়াছিল যে তাহাদের প্রস্রাব নালী হইতে রক্ত বাহির হইতে থাকে। আর এক নূতন ধরণের অত্যাচার হয় যে, প্রহার করিয়া অজ্ঞান

করিবার পরিবর্ত্তে নির্য্যাতিতের গুহ্যদেশে একখণ্ড রুল ঢুকাইয়া ঘুরাইতে থাকিত, উহার ফলে নির্য্যাতিত ব্যক্তি যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকিত।

কাঁথি মহকুমা

তমলুক মহকুমার ন্যায় কাঁথিও মেদিনীপুর জেলার একটা মহকুমা। ইহার এলাকায় ছয়টী থানা আছে। যথা:—রামনগর, কাঁথি, ভগবানপুর পটাশপুর, খেজুরী, ও এগ্রা। এই মহকুমার লোক সংখ্যা প্রভৃতি প্রায় তমলুক মহকুমার ন্যায়। এই মহকুমাতেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভের পূর্ব্বে প্রতি ইউনিয়নে প্রতি থানাতে কংগ্রেস কমিটী ছিল।

আগষ্ট আন্দোলন কাঁথি ও তমলুকে সমানভাবেই চলিয়াছিল। আন্দোলনের ফলে খেজুরী, পটাশপুর ও রামনগর প্রভৃতি থানায় কিছুদিনের জন্য বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটিয়াছিল।

কাঁথি মহকুমাতে ছাব্বিশটি ডাকঘর, তিনটি, সাবরেজেষ্টারী অফিস চল্লিশটি খাসমহল অফিস, চল্লিশটি ইউনিয়ন বোর্ড অফিস, ছাব্বিশটি অন্যান্য অফিস, আটাশটি সেতু, সাতটি মদের দোকান, বারটি ডাকবাংলা ভস্মীভূত বা ধ্বংস করা হয়। উপরোক্ত প্রত্যেক অফিসের জিনিষ পত্র ধ্বংস করা হয়। খেজুরী থানায় সমস্ত টেলিগ্রামের থাম অপসারিত করা হয়। অন্যান্য থানায়ও এইরূপ করা হয়। জাতীয় গভর্ণমেণ্ট বহু সরকারী অফিসার, থানার কর্ম্মচারী, দারোয়ান, কনেষ্টবলকে গ্রেপ্তার করে। বহু মেল বাস নষ্ট করা হয়, নানা স্থানে রাস্তা কাটা হয়, বহু পয়ঃপ্রনালী নষ্ট করা হয়, তেরটি বন্দুক কাড়িয়া লওয়া হয়। তমলুকও কাঁথী মহকুমার বড় নেতারা

সব গ্রেপ্তার হওয়া সত্ত্বেও এই দুই মহকুমার সর্বত্র প্রতি গ্রামে অসংখ্য সভা ও শোভাযাত্রা হয়। কয়েক দিনেই আনুমানিক ষোল হাজার লোক স্বেচ্ছাসেবক শ্রেণীভুক্ত হয়। সংগঠনের উদ্দেশ্যে প্রতি ইউনিয়নে শিবির স্থাপন হয়। সমস্ত স্কুল বন্ধ হইয়া যায়। ছাত্ররা দলে দলে স্বেচ্ছাসেবক হয়। অনেক শিক্ষক ও কর্ম্মত্যাগ করেন। যুদ্ধ তহবিলে টাকা দেওয়া বন্ধ হইল। কাঁথি বাজারে নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য বিক্রয় বন্ধ হইল। ফলে তিন সপ্তাহ সহর জন শূন্য হইল। সরকারী কর্ম্মচারীদের দুর্দ্দশার চরম হইল। আদালত সম্পূর্ণভাবে বর্জ্জিত হইল। কেহই মামলা করিতে আসিল না। বহু চৌকিদার ও দফাদার স্বেচ্ছায় চাকুরিতে ইস্তাফা দিয়া এই আন্দোলন পরিচালনা করিবার জন্য **সমর পরিষদ** গঠিত হয়।

ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ প্রচণ্ড আকার ধারণ করিবার পর জনসাধারণের নামে শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়। সমর পরিষদগুলি কিছুদিন পর্য্যন্ত আন্দোলন পরিচালনা করিয়াছিল। কিন্তু সরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহ আংশিকভাবে কিম্বা সম্পূর্ণরূপে অচল হইবার পর কোন না কোন নামে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। কাঁথি মহকুমায় পটাসপুর এবং খেজুরী থানায় প্রায় এক মাস পর্য্যন্ত সরকারী কর্ত্তৃত্বের কোনরূপ চিহ্ন ছিল না। এবং এই দুইটি থানায় **পূর্ণ কর্ত্তৃত্বশাল জাতীয় গবর্ণমেণ্ট** প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত রামনগর এবং ভগবানপুর থানাতেও জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। জাতীয় গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তা হিসাবে একজন **সভাপতি** অথবা **ডিক্টেটর** থাকিতেন। সভাপতি অথবা ডিক্টেটরের অধীন একটি **মন্ত্রণা পরিষদ** অথবা **মন্ত্রিসভা** থাকিত। মন্ত্রীদের অধীনে **স্বরাজ বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ, বিচার বিভাগ** প্রভৃতি দপ্তর থাকিত।

জাতীয় গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীন সমগ্র অঞ্চল (থানা) কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এলাকায় বিভক্ত করা হইয়াছিল। এই সমস্ত এলাকায় জনসাধারণ কর্তৃক নির্ব্বাচিত পঞ্চায়েৎ বোর্ড শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিত। এখানেও নিদারুণ অত্যাচার আরম্ভ হইল। সেই অত্যাচারের বিস্তৃত বিবরণ এই ক্ষুদ্র পুস্তকে দেওয়া সম্ভব নয়। মোটামুটি কাঁথির ক্ষতির হিসাব দেওয়া গেল:—গুলিতে মৃত্যু—৩৯, গুলিতে আহত—১৭৫, নারীধর্ষণ পুলিশ বা মিলিটারি দ্বারা—২২৮, গৃহদাহ—৯৬৫, গৃহদাহে ক্ষতি—৫৷৹ লক্ষ টাকা, গ্রেপ্তারের সংখ্যা—১২,৬৮১, দণ্ডিতের সংখ্যা—৬৭২, লুণ্ঠিত গৃহের সংখ্যা—২০৫৯, লুঠতরাজের (পুলিশ দ্বারা) ক্ষতির পরিমাণ ৩৷৹লক্ষ টাকা, লাঠিতে আহত—৬৬৮৫, পাইকারী জরিমানা ৩০০০০৲ টাকা। একজন অফিসার দিনে দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের সাহায্য করিতেন। রাত্রে সৈন্যদের সাহায্যে জনসাধারণের গৃহে হানা দিতেন। প্রভাতকুমার কলেজের মাসিক আড়াই শত টাকা সাহায্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। বিনানুমতিতে বাস চালান বন্ধ হয়। সমগ্র মহকুমায় পাঁচ শত সৈন্য মোতায়েন হয়। পুলিশ ও মিলিটারির কার্য্যকলাপের যাহাতে ফটো না লওয়া হয় সেজন্য গভর্ণমেণ্ট বে-সামরিক লোক ও ব্যবসায়ীদের নিকট ক্যামেরা কাড়িয়া লয়। আর সকলের কাছ থেকে বন্দুকও কাড়িয়া লওয়া হয়। ১৯৪২ সালে জুন মাসে বঞ্চনা নীতি কার্য্যকরী করার সময় সমস্ত সাইকেল ও নৌকা অপসারণ করা হয়। খেজুরী থানায় লোকদিগের মনোবল দমন করিবার জন্য ভদ্রলোকগণকে চৌকিদারী ট্যাক্স দিবার ছল করিয়া ডাকাইয়া আনিয়া ভয় দেখাইয়া পূর্ব্ব চিহ্নিত পাঁচ গজ স্থানে নাক খত দেওয়ান হয়। তা'ছাড়া বহুলোককে বেত্রাঘাত, মারপিট করা হয়, বিনা বিচারে বহুলোককে আটক রাখা হয়।

প্রলয়ঙ্কর বন্যা ও ঝটিকা

১৯৪২ সালের ১৬ই অক্টোবরের প্রলয়ঙ্কর বন্যা ও ঝটিকার দিন ও পরেও মেদিনীপুর জেলায় উপরোক্ত প্রকারের নৃশংস কার্য্যকলাপ সমানভাবে গভর্ণমেণ্ট চালাইতে থাকে। এমন কি তমলুকের মহকুমা হাকিম কলিকাতা হইতে ঘূর্ণিবার্ত্তার সম্ভাব্যতা সম্পর্কিত তিন খানি টেলিগ্রাম পাওয়া সত্ত্বেও তিনি তৎসম্বন্ধে জনসাধারণকে সাবধাণ করা এবং এই সংবাদ প্রচার করিবার জন্য কোনরূপ ব্যবস্থাই অবলম্বন করেন নাই। অধিবাসীবৃন্দের তরফ হইতে সেই দুর্য্যোগ-ঘন-রাত্রির জন্য সাময়িকভাবে সান্ধ্য আইন প্রত্যাহারের দাবী জানাইলে তিনি তাহাতেও কর্ণপাত করেন নাই।

এই বন্যা ও ঝড়ের সংবাদ এবং ইহার ফলে যে সমস্ত ক্ষতি হয় তৎসংক্রান্ত সমুদয় সংবাদই চাপিয়া রাখা হয়। গাছের মাথায় ও ঘরের চালায় আশ্রয় লইয়া যাহারা জলোচ্ছ্বাসের হাত হইতে কোনমতে আত্মরক্ষা করিয়াছিল, তাহাদের নিরাপদ স্থানে পৌছিয়া দিবার জন্য নিষিদ্ধ এলাকায় নৌকা চলাচল পর্য্যন্ত করিতে দেওয়া হয় নাই। যথাযথ সাহায্যের অভাবে যখন শত শত গ্রামবাসী মরিতেছিল তখন সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরিয়া কোনরূপ সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা তো করা হয় নাই, এমন কি বে-সরকারী সাহায্য-প্রতিষ্ঠানগুলিকে পর্য্যন্ত মাসখানেক যাবত কোনরূপ কাজ করিবার অনুমতি দেওয়া হয় নাই। মাড়োয়ারী রিলিফ সোসাইটীর জনৈক কর্ম্মী সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা নির্দ্ধারণের জন্য আসিলে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং দুর্গতদের সাহায্য দানের জন্য তিনি চাউল এবং অন্যান্য জিনিষ সঙ্গে আনিয়াছিলেন তাহা কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক বাজেয়াপ্ত করা হয়।

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বলেন যে, মেদিনীপুরের বিদ্রোহীগণ যে সমস্ত রাজনৈতিক দুষ্কর্ম্মকে প্রশ্রয় দিয়াছে তজ্জন্য তাহাদের এই দুর্ভোগ ভুগিতে হইবে।

জনমতের চাপে পড়িয়া অবশেষে জেলার কর্ত্তৃপক্ষ সরকারী সাহায্য বিতরণ কেন্দ্র খুলিতে এবং বেসরকারী সাহায্য সমিতিগুলিকে সাহায্য কার্য্য চালাইতে দিতে বাধ্য হন। যে সমস্ত লোক নিজেরাই সরকারী সাহায্যের বেশীর ভাগ অংশ গ্রহণ করিত তাহাদের দ্বারাই সরকারী সাহায্য বিতরণের কার্য্য পরিচালিত হইত। সাহায্যের জন্য যে সমস্ত জিনিষপত্র দেওয়া হইত তাহা আত্মসাৎ করাই এই সমস্ত লোকের প্রধান কাজ ছিল। সাধারণতঃ সরকারী গুপ্তচর, গভর্ণমেণ্টের সমর্থক, সরকারী কর্ম্মচারী ও গভর্ণমেণ্টের প্রতি অনুকূল মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিগণই এই সমস্ত সরকারী কেন্দ্র হইতে সাহায্য লাভ করিত। কিন্তু যাহারা প্রকৃতপক্ষে অভাবগ্রস্থ ও অসহায় ছিল তাহা দিগকে উপেক্ষা করা হইত।

-"বন্দেমাতরম্"—

—জয়হিন্দ—